দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৭১ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ২১ জানুয়ারি ২০১৯।। ৬ মাঘ - ১৪২৫।।
সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নেতাজী সুভাষ

দুর্নীতি ঢাকতেই পরিবারতন্ত্র

দেশের গণতন্ত্রকে পরিবারতন্ত্রের দাসে পরিণত করার চেষ্টা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৭১ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ৬ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২১ জানুয়ারি - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

খোলা চিঠি :জোট হোঁচট ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

কৃষককে সাহায্য করতে হলে তাকে কৃষিকর্মে থেকে তুলে নিতে হবে ▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ৮

মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গকে জেলখানায় পরিণত করার দুঃসাহস পাচ্ছেন কোথা থেকে? ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারিই সূচনা করল সোনিয়া-রাহুলের অগস্ত্যযাত্রার ▯ সনাতন রায় ▯ ১৩

কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রই শেষ কথা ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

দুর্নীতি ঢাকতেই পরিবারতন্ত্র ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ২৫

গান্ধী পরিবারের কৌশলী পরিকল্পনায় বিস্মৃত ফিরোজ গান্ধী ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৭

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ৩১

ভারতের স্বাধীনতা ও নেতাজী সুভাষ ▯ প্রণব দত্ত মজুমদার ▯ ৩৫

নেতাজীর মৃত্যু প্রচারে চক্রান্তকারীদের নির্লজ্জ প্রয়াস ▯ বেদমোহন ঘোষ ▯ ৩৯

মুখ্যমন্ত্রীর পোষা মিডিয়ার ছলনায় অপমানিত দিলীপ ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ চিত্রকথা : ৪১ ▯ নবাঙ্কুর : ৪৮-৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের বিপদ পরিবারতন্ত্রে

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতীয় সাধারণতন্ত্র। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট খাতায়-কলমে ভারত ইংরাজ শাসন মুক্ত হইলেও সেই দিনটিতেই ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৯৩৫ সালে ইংরাজ সরকার যে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট চালু করিয়াছিল, ইংরাজ ক্ষমতা হস্তান্তর করিলেও এই আইনটি তখনও কার্যকর ছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ব্রিটিশ প্রণীত আইনটিকে বিদায় জানাইয়া গণতন্ত্রকে শীর্ষে রাখিয়া প্রণীত হইল ভারতীয় সংবিধান। সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত, বিশ্বে সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র হিসাবে স্বীকৃত ভারতীয় গণতন্ত্র। ভারত ভাগ হইয়া ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট একটি দেশেরও জন্ম হইয়াছিল। সেই দেশটি ইসলামিক পাকিস্তান। কিন্তু জন্মলগ্ন হইতেই ভারতের এই প্রতিবেশী দেশটিতে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে। কার্যত সেনাবাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই রাষ্ট্রটিতে প্রথমাবধিই গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। অথচ, ভারতে গণতন্ত্রের শিকড় গভীরে নিহিত। এই দেশে কখনই সেনাবাহিনী ছাউনি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহে নাই। এই দেশে বরাবরই সরকার নির্বাচিত হইয়াছে জনগণের রায়ে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করিয়া গণতন্ত্রক পদদলিত করিতে চাহিলে ভারতীয় জনগণই ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁহাকে ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিয়াছিল। গণতান্ত্রিক ভাবনা এই দেশের গভীরে এতটাই প্রোথিত যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করিয়া স্বৈরতন্ত্রের প্রকাশ এই দেশে সম্ভবপর নহে। ইহাই ভারতীয় গণতন্ত্রের সৌন্দর্য, ইহাই ভারতীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশের সংবিধান প্রণেতারা বরাবরই গণতন্ত্রকে সবার উপরে স্থান দিয়াছেন। এই দেশের সমস্ত মানুষের সমানাধিকারের কথা মাথায় রাখিয়া সংবিধানটি প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা। কোনও পরিবারতন্ত্র বা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতবর্ষের বুকে একটি সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হউক—এমনটিই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ছিল। সংবিধান প্রণয়ণের ছয় দশকেরও পরে, এই কথা স্বীকার করিবার জন্য দ্বিধাবোধ করিবার কারণ নাই যে, সংবিধানের সেই প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আমরা সত্যই অনেকাংশে রক্ষা করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবার এবং দল গণতন্ত্রকে বারে বারেই পদদলিত করিয়াছে। গণতন্ত্রের বদলে তাহাদের কাছে প্রাধান্য পাইয়াছে পরিবারতন্ত্র। জনগণের রায় অপেক্ষা তাহারা অধিকতর নির্ভর করেন নির্লজ্জ তোষণের রাজনীতি, নির্বাচনে বুথ দখল এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করিবার উপর। সোনিয়া-রাহুল গান্ধী এবং তাঁহাদের কংগ্রেস; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার তৃণমূল কংগ্রেস, মুলায়ম-অখিলেশ যাদব ও তাঁহাদের সমাজবাদী পার্টি, লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল, চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টি এবং বহেনজী মায়াবতীর দল বহুজন সমাজ পার্টি এই তালিকায় পড়ে। ইহাদের ভিতর অগ্রগণ্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এই দেশে কেন্দ্র সরকারে সর্বাধিক বেশি সময় ক্ষমতা ভোগ দখল করিয়াছে কংগ্রেস। আর কংগ্রেস দলের নামে নেহরু-গান্ধী পরিবার। মাঝে যে দুই একজন কংগ্রেস নেতা প্রধানমন্ত্রী পদের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাহাও ওই পরিবারের দয়ায়। কংগ্রেস দলটিকেও এই পরিবার তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে। এবং দীর্ঘদিন ক্ষমতা ভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হইয়াছে এই পরিবার। লালুপ্রসাদ, মুলায়ম, মমতা, মায়াবতী, চন্দ্রবাবু সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দুর্নীতিকেই ইহারা প্রশ্রয় দিতেছেন। ইহাদের মধ্যে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছেন।

ভারতীয় গণতন্ত্রকেই ইহারা ধ্বংস করিতে চান। রাজনৈতিকভাবে ইহাদের বিতাড়িত না করিলে ভারতীয় গণতন্ত্র তার প্রকৃত লক্ষ্যে উন্নীত হইতে পারিবে না।

সুভাষিতম্

পাপং প্রজ্ঞা নাশয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ।

নষ্টপ্রজ্ঞঃ পাপমেব নিত্যমারভতে নরঃ।। (বিদুরনীতি)

বারবার পাপ কাজ করতে করতে মানুষের বিবেক ও বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। যার বিবেক ও বুদ্ধি নষ্ট হয়েছে সে শুধু পাপই করতে থাকে।

With Best Compliments From :-

A Well Wisher

Baijnath Shreelal

-: Mfgs. of :-

Handloom Silk,
Furnishing Cloth and
Cotton Dress
Materials

Head Office
Nathnagar, Bhagalpur (Bihar)

Branch Office
193/1, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007
Mobile : 9831126557

An ISO 9001:2008 Company

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),
1st Floor, Suit # 01
Kolkata - 700 006
(Near Calcutta Medicos)

Phone : +91 33 2530 7780 / 81, E-mail : ashok@acclogistics.in
URL : www.acclogistics.in

জোট হোঁচট

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুপ্রিমো, তৃণমূল কংগ্রেস

লোকসভা নির্বাচনের আগে আপনার কাছে বড়ো স্লোগান বিরোধী জোট। সেই লক্ষ্যে গোটা দেশকে এক করতে চাইছেন। তাকিয়ে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের দিকে। কিন্তু শুরুতেই যে ধাক্কা খেল জোট প্রক্রিয়া। হাসি ফুটল নরেন্দ্র মোদী তথা, বিজেপির মুখে।

দেশের সর্ববৃহৎ সাজ্য উত্তরপ্রদেশে জোট সম্ভাবনা রইল না। আগেই সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টির মধ্যে জোট হয়েছে। কিন্তু সেই জোটে নেই কংগ্রেস। পরে কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের ৮০টি আসনেই প্রার্থী দেবে তারা। আর এই ঘোষণায় তো রীতিমতো স্বস্তি বিজেপি শিবিরে।

জাতীয় রাজনীতিতে বরাবরই বলা হয়— 'উত্তরপ্রদেশ যার, দিল্লি তার।' সেই প্রবাদ সত্য হয়েছিল ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে। তবে সেবার বিজেপি বিরোধী কোনও জোটই ছিল না। ৮০ আসনের মধ্যে ৭৮টিতে প্রার্থী দিয়ে ৭১টি আসনে জয় পায় বিজেপি। এনডিএ সঙ্গী আপনা দল ২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে দু'টিতেই জয় পায়। মায়াবতীর বহুজন সমাজ পাটি একক লড়াইয়ে ৮০ আসনে প্রার্থী দিয়ে একটিতেও জয় পায়নি। অন্যদিকে কংগ্রেস ৬৬টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পায় ২টিতে জয়। আর রাজ্যের তৎকালীন শাসকদল মুলায়ম সিংহ যাদবের সমাজবাদী পাটি ৭৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে জয় পায় ৫টি আসনে।

উল্লেখ্য, কংগ্রেস এবং সপার মধ্যে কোনও জোট না হলেও সেবার

সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দেননি মুলায়ম। অন্যদিকে, মুলায়ম, অখিলেশ-পত্নী ডিম্পল-সহ যাদব পরিবারের ৫ জনের বিরুদ্ধেও প্রার্থী দেয়নি কংগ্রেস। দুই পরিবারের অঘোষিত জোটে জয় মেলে দুই দলের দুই পরিবারের ৭ জনের। মোদী ঝড়ে বাকি সব আসনই যায় এনডিএ-র দখলে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বলছে, গত বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিপুল জয়ের পরেও এবার বিরোধী জোট ধাক্কা দিতে পারত গেরুয়া শিবিরকে। কিন্তু এখন বিরোধী ভোট দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার মুখে। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির দখলে ছিল ৪২.৩০ শতাংশ ভোট। সেখানে সপার ২২.২০ ও বসপার ১৯.০৬ শতাংশ। এর সঙ্গে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ৭.০৫ শতাংশ ভোট যুক্ত হলে চিন্তা ছিল বিজেপির। উলটে এখন যে ভাবে রাহুল গন্ধীর উত্থান হয়েছে তাকে কংগ্রেসের ভোট বাড়লেও মহাজোট না হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা পেয়ে যাবে বিজেপি।

২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও সপা-কংগ্রেস জোট রাজ্যে ২৮ শতাংশের মতো ভোট পেয়েছিল। বসপা পেয়েছিল ২২ শতাংশের বেশি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে মহাজোট হলে তা অনেকটাই চাপের ছিল বিজেপির কাছে। দিদি আপনার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে।

আমি কী বলি দিদি, এই রাজ্যে কংগ্রেস যদি রাজি নাই হয়, তবে সিপিএমের সঙ্গে জোট করে নিন। ওদের ভোটব্যাঙ্কটা ছোটো হলেও সলিড।

— **সুন্দর মৌলিক**

কৃষককে সাহায্য করতে হলে তাকে কৃষিকর্ম থেকে তুলে নিতে হবে

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

আজকের তারিখে সার, বিদ্যুৎ, শস্য বিমা, বীজ, ঋণ বা সেচের মতো বিবিধ খাতে সরকার কৃষককে প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার মতো ভরতুকি দিয়ে থাকে। খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়ার পর তা সরকারের তরফে সংগ্রহ করার ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাজারের দরের চেয়ে সে যাতে বেশি পায় এ নিয়ে বহু কৌশল গ্রহণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে ৭৫ শতাংশ জনসংখ্যাকে বিরাট অনুপাতের ভরতুকি সংবলিত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এছাড়া প্রতি পরিবার পিছু বছরে ১০০ দিনের কাজে একজন প্রাপ্তবয়স্কের নিযুক্তিও নিশ্চিত আছে।

গ্রামীণ গরিব পরিবারগুলিকে বিনা খরচায় গৃহ ও এল পি জি সংযোগ দেওয়া, নিশুল্ক প্রাথমিক শিক্ষা ও নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ারও ব্যবস্থা বহাল। এছাড়া সরকারের তরফে পরিকাঠামো খাতে রাস্তা তৈরি, ডিজিটাল সংযোগের সঙ্গে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে বড়ো মাত্রায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। সাত দশকের এই উন্নয়ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও টিভি চ্যানেলগুলি খুললে নিত্যদিন অনর্গল কৃষক দুর্গতির সচিত্র সংবাদ সম্প্রচারিত হয়। কেন? এটা আন্দাজ করা যায় যে মানুষের দুর্গতির খবরাখবর তার অবস্থার ইতিবাচক কোনও পরিবর্তনের ছবির থেকে অতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলতে দ্বিধা নেই এক্ষেত্রে প্রচারমাধ্যমের কায়েমি স্বার্থ সদা সক্রিয়। তারা অধিকাংশ সময়ই একপেশে খবর চাউর করে। ভারতের মতো বিশাল দেশের কোনও না কোনও অঞ্চলে কৃষকদের দুরবস্থা কোনও না কোনও সময় লেগেই থাকে। তাই, গুরুত্বপূর্ণ সময় সম্প্রচারের জন্য এমন রসদই চ্যানেলগুলির উপাদেয় মনে হয়।

মানুষের মধ্যে অন্তর্লীন এক ধাঁচে ফেলে দেওয়ার প্রবণতার কারণে একটি কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও খবর যদি তা আবার দৃশ্যায়িত অবস্থায় পরিবেশিত হয় তাকে সারা দেশের সর্বাঙ্গীন অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় করে তুলতে দেরি হয় না। হায়! এর বিপরীতে নিরেট পরিসংখ্যান সংগ্রহ খুব কঠিন। করতে পারলেও হজম করা আরও শক্ত। একই সঙ্গে ছবির সঙ্গে যে গল্প প্রদর্শিত হয় তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দুষ্কর।

হ্যাঁ, এই ধরনের অনুমানের মধ্যে কিছু সত্য নিহিত থাকলেও একই সঙ্গে মানুষের দুরবস্থার যে চিত্রায়িত খবর দেখানো হয় তার সত্যতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর চার দশক ধরে ভারত ভ্রান্ত নীতি অনুসরণের ফলে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম মাথা পিছু আয়ের দেশের পঙ্ক্তিতেই রয়েছে। এই সামগ্রিক পটভূমির প্রেক্ষিতে দেশের কৃষি উন্নয়ন আবার শিল্প বা পরিষেবা ক্ষেত্রের তুলনায় শ্লথ গতিতে চলেছে।

১৯৫১-৫২ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত

এই ৬৫ বছরে শিল্পোন্নয়ন বার্ষিক গড়ে ৬.১ শতাংশ, পরিষেবা ক্ষেত্র ৬.২ শতাংশ কিন্তু কৃষি উন্নয়ন মাত্র ২.৯ শতাংশ হারে বেড়েছে। এই নজরে পড়ার মতো উন্নয়ন বৈষম্যের কারণে ১৯৫০-৫১ সালের জিডিপি-র বিশাল ৫৩.১ শতাংশ থেকে কৃষির ভাগ ১৬-১৭ সালে মাত্র ১৫.২ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে, সংখ্যাতত্ত্বের এই ক্রমহ্রাসমান হিসেব মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই একে নিয়ে হতাশ হওয়ারও কিছু নেই। এর কারণ প্রথাসিদ্ধ ভাবে এটাই ধরা হয় যে দেশ যতই প্রগতির দিকে এগোয় ততই তার শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের উন্নয়নের হারই বেশি বাড়ে। কম হতে থাকে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার যার অর্থ দেশে মাথাপিছু আয় বাড়ছে, দেশ ধনী হয়ে উঠছে। পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাবে দেশের সামগ্রিক জিডিপি-তে প্রত্যেকটি উন্নত দেশের কৃষিক্ষেত্রের অংশ অতি নগণ্য। মাথাপিছু আয়ে দক্ষিণ কোরিয়া বিপুল অগ্রগতি করেছে— তাদের জিডিপি-তে কৃষিক্ষেত্রের অবদান ২ শতাংশ, তাইওয়ানের ১.৬, ফ্রান্সের ১.৫, জাপানের ১ ও ইংল্যান্ডের মাত্র ০.৫ শতাংশ।

ভারতের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য যে, এই সমস্ত দেশগুলির মতো ভারতের কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে রুজি রোজগার করা লোকের সংখ্যা সময়ের সঙ্গে মোটেই কমে আসেনি। দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে কৃষির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে ৫ শতাংশ মানুষ, জাপানে ৩.৫, ফ্রান্সে ২ ও ইংল্যান্ডে ১ শতাংশ এর বিপরীতে ভারতে কৃষিজীবী মানুষের হার ভয়ংকরভাবে বেশি, ৪৫ শতাংশ। এর ফলে দেশের জিডিপি-র অনুপাতে শ্রমিক প্রতি যে উৎপাদন তা কম হলেও কৃষি ক্ষেত্রে আবার সেই হার তারও এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ ক্ষতিকারকভাবে কম। এর পর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতন চাষযোগ্য জমির মাথাপিছু পরিমাণ শতকরা ৬৮.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ১ হেক্টরের কম। এর ফলে সমগ্র কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক প্রতি যে উৎপাদন এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিকানাধীন জমিগুলিতে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ আরও কম। এই তথ্যগুলি থেকে প্রমাণ হয় যে কৃষিক্ষেত্রে সরকার কোনওভাবেই কিন্তু কৃষকের সমৃদ্ধির কোনও ছিটেফোঁটা বাড় বৃদ্ধি করার অবকাশ তৈরি করতে পারবে না। বিপণন বা কৃষিসামগ্রী বিক্রয় ক্ষেত্রে সংস্কার যদি ঠিকঠাক হয়, তার পরেও অনেক কিন্তু থেকে যাবে। এই সংস্কার বেশি দূর যেতে পারবে না। কৃষি শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদন অত্যন্ত কম হওয়ায় তার সংরক্ষণের পর লাভ করে বড়ো ব্যবসায়ীরা তাদের বিশেষ কিছুই দিতে পারবে না।

> **সাম্প্রতিক কৃষিঋণ মকুব বা ভবিষ্যতে কৃষকের কল্যাণে আনীত আরও কোনও সুচিন্তিত সরকারি প্রকল্প ‘আশ্চর্য প্রদীপের’ মতো তার দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে একথা ভাবা অনেকটাই চিন্তাভ্রম।**

উৎপাদনশীলতা বাড়াবার সম্ভাবনাও খুব বিশেষ কিছু নয়। ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনে এখনই স্বাবলম্বী। বাড়তি খাদ্যশস্যের উৎপাদন তার বিক্রির ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা তৈরি করবে। দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্যের মজুত দামের ওপর ক্ষতিকারক চাপ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে যে কারণে এর দামের ওপর এম এস পি নির্ধারণের সময় অতিরিক্ত ভরতুকি দেওয়া হয়েছে রপ্তানির সময় ডব্লুউ টি ও-এর শর্ত অনুযায়ী খাদ্যশস্যের দেয় রপ্তানি শুল্ক অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হবে। দাম বেড়ে যাওয়ায় কারণে তা প্রতিযোগিতায় টিঁকতে পারবে কিনা বলা শক্ত।

অবশ্যই কৃষিক্ষেত্রে বহুমুখীকরণের প্রসঙ্গ অনেকে তুলছেন। এক্ষেত্রে দেখা গেছে চাষযোগ্য জমির মাত্র ৫ শতাংশ অংশে ফল ও শাকসবজির চাষ হয়। পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের প্রকল্পগুলিতে শ্রমশক্তির মাত্র ৫ শতাংশ নিযুক্ত আছে। সেই কারণে হঠাৎ যদি এই ক্ষেত্রে উৎপাদন দ্বিগুণ হয়ে যায় তার পরিণতিতে খুব অল্পসংখ্যক লোকই অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু উৎপাদনে বিপুল বৃদ্ধির চাপে মূল্যস্তর ভেঙে পড়তে পারে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে,কৃষি থেকে প্রাপ্ত লাভের অতি নগণ্য পরিমাণই চাষির হাতে যেতে পারে। সাম্প্রতিক কৃষিঋণ মকুব বা ভবিষ্যতে কৃষকের কল্যাণে আনীত আরও কোনও সুচিন্তিত সরকারি প্রকল্প ‘আশ্চর্য প্রদীপের’ মতো তার দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে একথা ভাবা অনেকটাই চিন্তাভ্রম। কেননা কঠোর বাস্তব হচ্ছে পরিমাণে অতি কম উৎপাদন কিন্তু অনেক বেশি লোক তার ভাগ নেওয়ার কারণে কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সফল হবে না।

আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অতীতে সৃষ্ট। বাধাগুলিকে ক্রমান্বয়ে অপসারিত করতে হবে। প্রথমেই থাকবে বিপুলসংখ্যক প্রান্তিক চাষিকে কৃষি থেকে স্থানান্তরিত করা। এরই পরিপূরক হিসেবে শিল্পের যে সমস্ত ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক শ্রমিকের দরকার হয়— সেই ধরনের উৎপাদন ও পরিষেবা শিল্পকে যুগপৎ মদত দিতে হবে।

(লেখক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক)

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে ‘রিসিভ’ করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

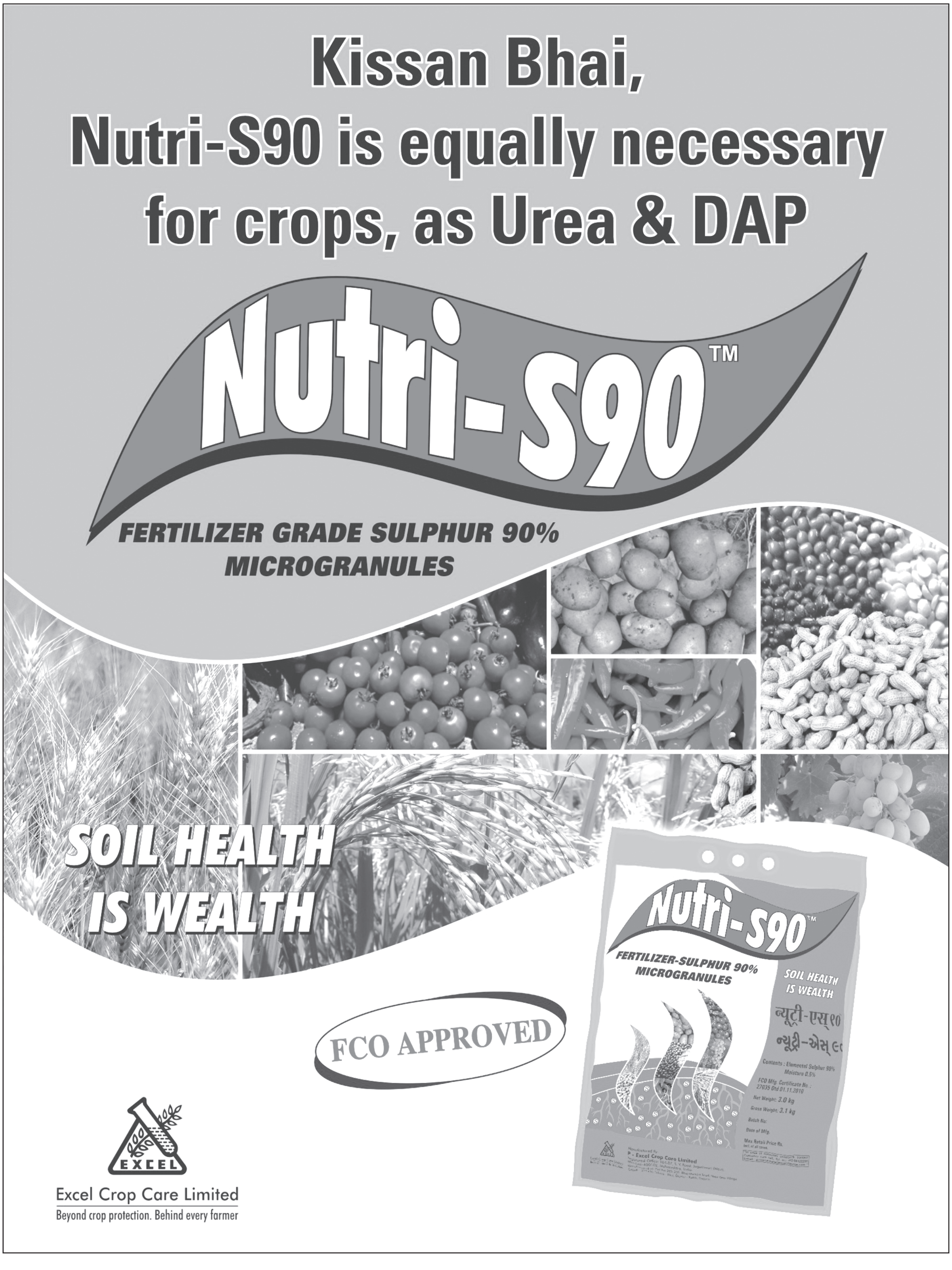

Kissan Bhai,
Nutri-S90 is equally necessary for crops, as Urea & DAP
Nutri-S90™
FERTILIZER GRADE SULPHUR 90% MICROGRANULES
SOIL HEALTH IS WEALTH
Nutri-S90™
FERTILIZER-SULPHUR 90% MICROGRANULES
SOIL HEALTH IS WEALTH
FCO APPROVED
EXCEL
Excel Crop Care Limited
Beyond crop protection. Behind every farmer

মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গকে জেলখানায় পরিণত করার দুঃসাহস পাচ্ছেন কোথা থেকে?

সাধন কুমার পাল

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে সরকার গঠনের পর কংগ্রেস নেতারা স্বরূপ ধারণ করতে শুরু করেছেন। রাহুল ধরেই নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে তিনি বসেই গিয়েছেন। গান্ধী পরিবারের যুবরাজের হাবেভাবে স্পষ্ট যে এই দেশ তাদের পরিবারের খাস তালুক। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি ওদের পারিবারিক সম্পত্তি। ভাষা ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। ইদানীং রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে যে সমস্ত ভাষায় কথা বলছেন, সংসদে রাফাল নিয়ে বিতর্ক চলার সময় রাহুল গান্ধী স্বয়ং চোখ মেরে ইশারা করে যে অঙ্গভঙ্গি করেছেন, কংগ্রেস সাংসদরা শাসক দলের উদ্দেশ্যে যে ভাবে কাগজের প্লেন ছুঁড়েছেন, তাতে গান্ধী পরিবারের সেই ঔদ্ধত্যের ছাপ স্পষ্ট।

গত ৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পঞ্জাবে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক কর্মসূচি উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধীর বিদ্রূপাত্মক প্রতিক্রিয়া—রাফাল নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জ্ঞান দেওয়ার জন্য পঞ্জাবে চলে গিয়েছেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেসি শাসনের দৌলতে ভারতীয় রাজনীতিতে শিষ্টাচারের কোনও সীমারেখা গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া গান্ধী পরিবারের বাইরে কেউ প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসলে তাঁকে সহ্য করতে না পারা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এই পরিবারের পুরোনো অভ্যাস। এই ঔদ্ধত্য গান্ধী পরিবারের ডিএনএ-তেই রয়েছে। এতদিন রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক ছিলেন বলে এই পরিবার ও তার বাজনদার কংগ্রেসিদের নম্রভদ্র মনে হতো। কিন্তু আবার একটু প্রাসঙ্গিক হতেই গান্ধী পরিবার অ্যান্ড কোং স্বরূপ ধারণ করতে শুরু করেছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পদমর্যাদা যাই হোক

না কেন রাজনীতির মঞ্চ থেকে যে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যা খুশি তাই বলার এবং নিশানায় পরিণত করার একটি নোংরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি এদেশে গড়ে উঠেছে। এই নোংরামি যে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে কংগ্রেসি ডিএনএ-তে গড়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আচার আচরণের দিকে নজর দিলে তা আরও স্পষ্ট হবে। এই ধরনের নোংরামির পরিধি এতটাই বিস্তৃত হয়ে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমের কঙ্কালসার চেহারাটা তুলে ধরার একটি ছোট্ট প্রয়াস এই নিবন্ধে করা হলো।

নতুন বছরের প্রথম দিন এএনআই-এর এডিটর-ইন-চিফ স্মিতা প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে রাফাল চুক্তি, নোট বাতিল, জিএসটি, রামমন্দির, মোদী ম্যাজিক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই চোখা চোখা প্রশ্ন ছিল। এই সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য রাহুল গান্ধী স্মিতা প্রকাশকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন। একজন পেশাদার সাংবাদিকের উপর এই ধরনের আক্রমণের নজির মেলা ভার। একজন পেশাদার সাংবাদিকের উপর এই ধরনের আক্রমণের একমাত্র কারণ এটা হতে পারে যে, ওই সাংবাদিক মহোদয়া ওই সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কেন এমন কিছু করলেন না যাতে গান্ধী পরিবার মহিমান্বিত হয়। রাহুল গান্ধীর একজন পেশাদার সাংবাদিকের উপর আক্রমণের ধরন দেখে মূল স্রোতের মিডিয়া নিশ্চুপ থাকলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে জরুরি অবস্থার সময়ের কথা। জরুরি অবস্থার সময় কোন সংবাদপত্র কী ছাপবে, সম্পাদকীয়তে কী লিখবে সেটা ঠিক করে দেওয়া হতো কংগ্রেস কার্যালয় থেকে। অবাধ্য মিডিয়া হাউসগুলিতে তালা ঝুলিয়ে, বরুণ সেনগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষেদের মতো সংবাদ জগতের 'বেয়াড়া' লেখক সাংবাদিকদের জেলে পোরা হয়েছিল। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভটিকে। স্মিতা প্রকাশও রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে পাল্টা দিয়ে বলেছেন, একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে কোন সাক্ষাৎকারে কী প্রশ্ন করতে হবে সেটা ওর ভালোই জানা আছে এবং ভবিষ্যতে পেশাগত ব্যাপারে এরকম হস্তক্ষেপ করলে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

এডিটর্স গিল্ড অব ইন্ডিয়া নামকাওয়াস্তে নিন্দা করলেও সাংবাদিকদের কাজের স্বাধীনতার উপর রাহুল গান্ধীর হস্তক্ষেপ নিয়ে মূল স্রোতের মিডিয়ার নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই নীরবতার তুলনা অতি সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলে মিজোরাম ও তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের পরাজয় নিয়ে নীরবতার সঙ্গে করা যেতে পারে। শোনা যায় কংগ্রেস দলের তরফ থেকে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরের বেশ কিছু লেখক, সম্পাদক ও মিডিয়া হাউসকে নিয়মিত মাসোহারা দেওয়া হয়। এই সমস্ত লেখক, সম্পাদক ও মিডিয়া হাউসের একপেশে ভাবনার বহিঃপ্রকাশ প্রমাণ করে যে এই ধরনের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

রাফাল যুদ্ধবিমান চুক্তি নিয়ে রাহুল গান্ধী অনেকদিন ধরেই সরব। এই নিয়ে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই যুদ্ধ বিমান কেনার চুক্তিতে যে কোনও অস্বচ্ছতা নেই সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন এটা প্রমাণিত যে রাফাল নিয়ে কংগ্রেসের আনা অভিযোগের কোনও সারবত্তা নেই। বর্তমান কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ইস্যুহীন কংগ্রেসিরা যে দেশের প্রতিরক্ষার মতো সংবেদনশীল রাফাল যুদ্ধবিমান চুক্তিটিকে রাজনীতির নোংরা খেলায় পরিণত করতে চান এটা স্পষ্ট। ফলে গান্ধী পরিবারের এই যুবরাজ চীন ও পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে রাফাল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে যাচ্ছেন। শালিনতা, শিষ্টাচার, দায়বদ্ধতাহীন ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসিরা তাদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটা যেন করতেই পারেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়ার ভূমিকা অবাক করার মতো। মিডিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সবার কথা তুলে করবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু রাফাল নিয়ে মিডিয়া সুপ্রিম কোর্টের টিপ্পনী কিংবা ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, কিংবা ফ্রান্সের প্রাক্তন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কোনও মন্তব্য তুলে ধরে সত্য প্রকাশের ভূমিকা পালন না করে একপেশে ভাবে রাহুল গান্ধীর বক্তব্যই তুলে ধরছে। আগুস্তা ওয়েস্টল্যান্ড কপ্টার চুক্তি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার ক্রিশ্চিয়ান মিশেল সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী দুজনের নামেই কমিশন নেওয়ার অভিযোগ এনেছেন, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় মা-পুত্র দুজনেই জামিনে আছেন। রাফাল নিয়ে সরব মিডিয়া গান্ধী পরিবারের এই সমস্ত দুর্নীতিতে নীরব কেন? কেনই বা মিডিয়া মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে গান্ধী পরিবারের জামাই রবার্ট বাঢ়ড়ার নানা দুর্নীতিতে যুক্ত থাকা নিয়ে। আজ তক, এনডিটিভি, এবিপি নিউজের মতো বড়ো বড়ো মিডিয়া হাউসগুলির একপেশে সংবাদ পরিবেশন দেখলে মনে হয় না যে এদের সত্যের প্রতি বা দেশ সমাজের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা আছে।

বাংলা সংবাদমাধ্যমগুলির তো আরও খারাপ অবস্থা। ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসার পর মিডিয়ার উপর শুরু হয় ক্ষমতাসীন দলের আগ্রাসন। সত্য প্রকাশের তাগিদে যে সমস্ত মিডিয়া সরকারের বা তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করতে শুরু করেছিল সেই সমস্ত মিডিয়া খোদ তৃণমূল নেত্রীর নেক নজরে পড়ে। কোনও রাখঢাক নয় প্রকাশ্য হুমকির সম্মুখীন হতে হয় সেই সমস্ত মিডিয়া গোষ্ঠীকে। সত্য কথনের দায়ে শাসকের হাতে একশ্রেণীর মিডিয়াকে লাঞ্ছিত হতে দেখে মিডিয়া জগতের অবশিষ্ট অংশ মৌনতা অবলম্বন করে। ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে সরকারি দপ্তরগুলিতে কোন কোন সংবাদপত্র রাখতে হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হয়। বিশেষ করে এই ঘটনার পর থেকে বাংলা সংবাদমাধ্যমগুলি নেত্রীর বাজনদার মিডিয়া গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম জরুরি অবস্থা দেখেনি। যাদের জরুরি অবস্থার দিনগুলির অভিজ্ঞতা আছে তাদের অনেকেরই বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে এখন যা চলছে তা জরুরি অবস্থার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। এখানে বিরোধীদের সভা সমিতি করতে দেওয়া হয় না, ক্ষমতাসীন দলের সবুজ সংকেত ছাড়া অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও কোনওরকম কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে না। গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভাগুলিতে বরাদ্দ অর্থের বাটোয়ারা নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গই এখন অশান্ত। সীমান্ত জেলাগুলিতে গোপাচার অবৈধ চোরাচালানের জন্য গড়ে ওঠা বেআইনি সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সৃষ্ট অশান্তি ঘিরে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ক্ষমতাসীন দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বেআইনি অস্ত্রের রমরমা রাজ্যের সর্বত্র। কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বসমক্ষে কুলতলি থানার ওসিকে বলতে শোনা গেছে, 'আপনার এলাকা তো বোমা তৈরির কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে না কেন? 'পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হলে কোনও মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারেন। আজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রসাতলে যাচ্ছে। বাংলা মিডিয়া যেন কিছু জানেও না, দেখেও না। অথচ এই মিডিয়া বিজেপি শাসিত রাজ্যে একটি বোমা উদ্ধার হলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা টকশো করে বিশ্লেষণের সুনামি বয়ে নিয়ে আসে।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে এ রাজ্যে মানুষের ভোটাধিকার পর্যন্ত নেই। তেমনি এ রাজ্যে মানুষের মেধার কোনও মূল্য নেই। কারণ এখানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সরকারি দপ্তর সর্বত্র নিয়োগ হচ্ছে নগদের বিনিময়ে। পাহাড় প্রমাণ ডিএ বকেয়া থাকাতে বঞ্চিত সরকারি কর্মচারীরাও। কেন্দ্র ও বিজেপি শাসিত রাজ্যের সমালোচনায় চ্যাম্পিয়ন বাংলা মিডিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভয়ংকর পরিস্থিতি নিয়ে মুক ও বধিরের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কালিয়াচক ও ধুলাগড়ের মতো ঘটনা নিয়ে নীরবতা পালন করলেও বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির কোনো ঘটনা নিয়ে এদের তৎপরতা, সংবেদনশীলতা, অতি সক্রিয়তার কোনো অভাব হয় না। আজকাল অনেককেই এই প্রশ্নটি করতে দেখা যায় যে সিপিএমের মতো ক্যাডার ভিত্তিক রেজিমেন্টেড দলও বাংলার মিডিয়াকে এতটা দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধতে পারেনি, মমতা পারলেন কী করে?

ইতিহাস বলছে, বিরুদ্ধ মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাব দিয়ে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের পিষে দেওয়ার মাইন্ডসেট কংগ্রেসি কালচারের অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই মাইন্ডসেটেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বরেণ্যকে কংগ্রেস ছাড়া করেছে, জরুরি অবস্থা জারি করে সমস্ত দেশকে জেলখানায় পরিণত করার মানসিকতা তৈরি করেছে, রাহুল গান্ধীকে স্মিতা প্রকাশের মতো অভিজ্ঞ সাংবাদিককে কুৎসিত ভাষায় গাল দিয়ে দমিয়ে দেওয়ার কাজে উৎসাহ জোগাচ্ছে। কংগ্রেসি ডিএনএ যুক্ত মমতা ব্যানার্জিও এই মাইন্ডসেট থেকেই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মিডিয়ার স্বাধীনতাকে পিষে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে জেলখানায় পরিণত করার, নরেন্দ্র মোদীর মতো রাষ্ট্র নেতাকে কোমরে দড়ি বেঁধে বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে জেলে ঢোকানোর হুমকি দেওয়ার মতো সাহস পাচ্ছেন। ■

অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড কেলেঙ্কারিই সূচনা করল সোনিয়া-রাহুলের অগস্ত্যযাত্রার

সনাতন রায়

অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ক্রিশ্চিয়ান মিচেল।

১৯৭২ সালে আমেরিকায় ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছিলেন দুই সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড এবং কার্ল বার্নস্টেইন। পরিণতিতে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে মার্কিন সেনেটে ইমপিচ করা হয়েছিল। নিক্সন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গোটা বিশ্বে সাড়া জাগানো এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেই ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির চেয়ে শতগুণ বড়ো কেলেঙ্কারি ঘটে গেল ভারতবর্ষের মাটিতে। সেই কেলেঙ্কারির নাম চপারগেট। সময় ২০১০ সাল।

তফাত একটাই। নিক্সনের রাজত্ব আর সম্মান— সব কিছুরই ভরাডুবি হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের চপারগেট কেলেঙ্কারির মহানায়করা, তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সব তথ্য উঠে আসার পরেও, দেশের, কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় ফিরে আসতে জোর কদমে ময়দানে নেমেছেন। গলাবাজি করছেন। আর নিজেদের দোষ ঢাকতে আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী আর বিজেপিকে কোণঠাসা করতে চাইছেন মনগড়া রাফাল কেলেঙ্কারির অভিযোগ খাড়া করে যা ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে।

আর সেই '৮০-র দশকের উত্তাল করা বোফর্স কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত নায়ক রাজীব গান্ধীর মতোই এই চপারগেট কেলেঙ্কারিতেও আপদমস্তক জড়িয়ে সেই গান্ধী পরিবার— রাজীব পত্নী সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন দল কংগ্রেসের নেতারা। হয়তো বা তিনি নিজে এবং তাঁর 'প্রধানমন্ত্রী অভিলাষী' পুত্র রাহুল গান্ধীও এই কেলেঙ্কারির উপন্যাসের নেপথ্য কুশীলব।

ঘটনাটা ঘটেছিল আট বছর আগে ২০১০ সালে নিঃশব্দে। আর বোমাটা ফেটেছিল আরও তিন বছর পরে ২০১৩ সালে। ফাঁস হয়েছিল, গোটা চপারগেট কেলেঙ্কারির ভিটেভূমি ছিল ইতালি যা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জন্মভূমি। বোফর্স কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত নায়ক রাজীব গান্ধীর শ্বশুরালয়। আজ ২০১৯-এ যখন লোকসভা ভোটের কাড়ানাকাড়া বেজে উঠেছে দেশের কোণায় কোণায়, যখন কংগ্রেস ধামসা মাদল নিয়ে ময়দানে নেমেছে সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হয়ে যাওয়া রাফাল কেলেঙ্কারি মামলার মেকী পুনরুজ্জীবন ঘটাতে, তখন প্রকাশ্যে এল চপারগেট কেলেঙ্কারির অন্যতম কুশীলব জনৈক 'R' যা ফাঁস করে দিয়েছেন চপারগেট মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ক্রিস্টিয়ান মিচেল (একজন মধ্যস্থতাকারী)। তিনি বলেছেন চপার ক্রয় সংক্রান্ত কেলেঙ্কারিতে নাকি জড়িয়ে রয়েছেন জনৈক 'মিসেস গান্ধী' আর 'ইতালীয় মহিলার পুত্র যিনি হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।" তার কোড নেম 'R'। মনে রাখা দরকার, রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আমলেই ঘটেছিল বোফর্স কেলেঙ্কারি। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর আমলে ঘটল চপারগেট কেলেঙ্কারি। এবং দুটো কেলেঙ্কারিরই জন্ম ইতালির মাটিতে। আজকের কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে যা অতি পছন্দের ইতালি।

স্মৃতির পর্দা ঝেড়ে একটু পিছন ফিরে তাকানো যাক। ভারতীয় বিমানবাহিনীর তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিমান বা অন্যান্য বিমান ছাড়াও থাকে বেশ কয়েকটি হেলিকপ্টার যা মূলত কিছু ভি আই পি-র ব্যবহারের জন্য মজুত রাখা হয়। ২০০৯ সালের মাঝামাঝি ভারতীয় বিমানবাহিনী সিদ্ধান্ত নেয়, পুরনো হেলিকপ্টারগুলি বাতিল করে নতুন ১২টি শক্তিশালী হেলিকপ্টার কেনা হবে যেগুলি ৩০০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতায় উড়তে পারে এবং ভি আই পি-দের নিয়ে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে সিয়াচেন বা টাইগার

হিলের মতো স্পর্শকাতর অঞ্চলে। উল্লেখ্য, এই ধরনের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী বা অতিগুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা। তাছাড়া ব্যবহারকারীদের তালিকায় রয়েছেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা ন্যাশানাল সেফটি এজেন্সির ডিরেক্টর, প্রতিরক্ষা সচিব, স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের প্রধান এবং সমকক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি আমলারা।

আন্তর্জাতিক স্তরে টেন্ডার আহ্বান করা হয় ২০১০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। তারই ভিত্তিতে সবচেয়ে জোরালো টেন্ডারটি ছিল ইতালিয় সংস্থা ফিনমেকানিকার। এই সংস্থা প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত বিমান এবং হেলিকপ্টার নির্মাণে গোটা পৃথিবীর মধ্যে একটি অগ্রগণ্য সংস্থা যাদের বিশ্বের ১৮০টি জায়গায় রয়েছে অফিস বা নির্মাণ ক্ষেত্র। যাদের হেডকোয়ার্টার হলো রোম। যাদের ২০১৭ সালের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১১.৫২৭ বিলিয়ন ইউরো। নেট আয় ছিল ২৭৪ মিলিয়ন ইউরো। আর কর্মীসংখ্যা? ৪৫১৩৪ জন। এ ধরনের একটি প্রোফাইল সমন্বিত কোম্পানিকে হেলিকপ্টারের বরাত দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অসুবিধা হলো। কারণ দেখা গেল, ফিনমেকানিকার তৈরি অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড ১০১ বা এ ডব্লুউ ১০১ হেলিকপ্টারগুলির ২০০০ মিটারের অধিক উচ্চতায় ওঠার সামর্থ্য নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের প্রধান এস পি ত্যাগী আবদার ধরে বসে রইলেন, ওই অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড চপারই কিনতে হবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরে ব্যবহারের জন্য অমন মজবুত চপারই দরকার।

অতএব ৩৬০০ কোটি দিয়ে ১২টি হেলিকপ্টার কেনার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অনুমোদনও মিলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিলমেকানিকার অফিসে পৌঁছে গেল ৫৪ শতাংশ অর্থ, টাকার অঙ্কে ১৬২০ কোটি টাকা। তখনও অজানা, এই বিরাট অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে ওয়াটারগেটের মতোই একটা কেলেঙ্কারি যার নায়ক কংগ্রেসের তাবড় নেতৃত্বের একাংশ আর ধুরন্ধর কিছু আমলা।

জানা গেল সেদিন, যেদিন ইতালির মাটিতে ঘুষ দেবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ফিনমেকানিকার চেয়ারম্যান জিউসেপ ওরসি (Giuseppe orsi) এবং অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড-এর সি ই ও ব্রুনো স্প্যাগনোলিনি। দুজনেই ইতালির নাগরিক এবং ঘুষ দিয়েছেন ভারত সরকারের হেলিকপ্টার কেনার ঘটনায়। বেআইনিভাবে বেশ কয়েকজন মিডলম্যান বা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মোটা অঙ্কের অর্থ, ২৫০ কোটিরও বেশি, পৌঁছে গেছে সরকারি আমলা এবং কংগ্রেস রাজনীতিবিদদের হাতে ঘুষ হিসেবেই।

তখন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সৎ রাজনীতিবিদ হিসেবে যথেষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তি এ কে অ্যান্টনি। ২০১৩ সালের ২৫ মার্চ তিনি বিবৃতি দিলেন— "হ্যাঁ, হেলিকপ্টার ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিতে দুর্নীতি ঘটেছে এবং ঘুষ নেওয়া হয়েছে। সিবিআই ঘটনাটির জোরালো তদন্ত শুরু করেছে।" (Yes, corruption has taken place in the helicopter deal and bribes have been taken. The CBI is pursuing the case vigorously.) ভারতবর্ষে যখন শম্বুকগতিতে এগোচ্ছে সিবিআই তদন্ত, ততদিনে ইতালির মিলান কোর্ট তার ২২৫ পৃষ্ঠার রায়ে জানিয়ে দিয়েছেন, ঘুষ দেবার অভিযোগে ফিনমেকালিকার চেয়ারম্যান জিউসেপ ওরসিকে কারাবাসে কাটাতে হবে সাড়ে চার বছর আর সি ই ও ব্রুনো স্পাগনোলিনিকে কারাবাসের অন্তরালে থাকতে হবে চার বছর। এছাড়া তাঁদের জরিমানা দিতে হবে ৭.৫ মিলিয়ন ইউরো বা সাড়ে আট মিলিয়ন ডলার। মিলান কোর্ট জানিয়েছিল, জরিমানার অঙ্কটি নির্ধারিত হয়েছিল, বিতরিত ঘুষের অঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতেই।

এহ বাহ্য। ২৭৫ পৃষ্ঠার রায়ের ১৭ পৃষ্ঠা জুড়ে ছিল ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রধান এস পি ত্যাগীর দুর্নীতির প্রসঙ্গ যে দুর্নীতিতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন ত্যাগীর তিন সম্পর্কিত ভাইও— সঞ্জীব, জুলি ও আইনজীবী গৌতম খৈতান এবং আরও দুজন ইতালীয় মধ্যস্ততাকারী কার্লো জেরোস এবং গুইডো হাসচকে (Guido Haschke) সহ মোট ১১ জন। গোটা বিশ্বের কাছে সেদিন মাথা নত করতে হয়েছিল ভারত সরকারকে যে সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর দেশের প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও বিকিয়ে দিয়েছিল কোটি কোটি টাকার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে।

ভারত সরকারের কোনও উপায় ছিল না, চুক্তি বাতিল করা ছাড়া। ২০১৪ সালে প্রতিরক্ষা দপ্তর হেলিকপ্টার কেনার চুক্তিটি বাতিল করে এই বলে যে, চুক্তিটি সম্পাদন করতে গিয়ে সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় আঘাত হানা হয়েছে (Integrity pact was violated)। একই সঙ্গে ভারত সরকার অগ্রিম হিসেবে দেওয়া ১৬২০ কোটি টাকা ফেরত দেওয়ারও দাবি জানায়। অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড সংস্থা ততদিনে দুটি হেলিকপ্টার সরবরাহ করে দিয়েছিল। সেই দুটির দাম বাদ দিয়ে বাকি টাকা ভারত সরকার ফেরত পেয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই।

পরবর্তীকালে ইতালির সুপ্রিম কোর্টে অভিযুক্তরা রেহাই পেয়ে গেলেও ভারতবর্ষের তদন্তকারীরা দেখেন বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে ২৮ মিলিয়ন ইউরোর বেআইনি লেনদেন হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে আন্তর্জাতিক ভাবে ঘুষ লেনদেন হয়েছে ৪২৩ কোটি টাকা। আর ওই লেনদেনে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছেন চণ্ডীগড়ের আই ডি এস ইনফোটেক এবং এয়ারোম্যাট্রিক্স। আইফোটেকের মালিক ছিলেন প্রতাপ আগরওয়াল। আর এয়ারোম্যাট্রিক্সের মালিক অভিষেক ভার্মা এবং অবধারিতভাবেই তাঁর রোমানিয়ান স্ত্রী অ্যামকা নিয়েকসু যারা মিডলম্যান হিসেবে তাঁদের রাজনৈতিক সোর্সদের কাজে লাগিয়ে হেলিকপ্টার কেনার চূড়ান্ত অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বার করে আনতে পেরেছিলেন।

২০১৬ সালের ৯ ডিসেম্বর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলো। ২০১৭-র সেপ্টেম্বরে পেশ করা হয়েছে চার্জশিট।

এরই মধ্যে কংগ্রেস তুলে আনল রাফাল দুর্নীতির খবর। এবং ওই রাফাল দুর্নীতিকে

আশ্রয় করেই বিধানসভার ভোটে বিজেপির কাছ থেকে কেড়ে নিল মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়। কিন্তু ভোটের পর সুপ্রিম কোর্ট নিদান দিল, রাফাল চুক্তি দুর্নীতিমুক্ত। তা সত্ত্বেও নতুন কংগ্রেস সভাপতি (যিনি পাপ্পু নামে ইতিমধ্যেই কুখ্যাত) রাহুল গান্ধী এখনও দিনরাত চিৎকার করে যাচ্ছেন, রাফাল চুক্তিতে দুর্নীতি হয়েছে এবং সেই চুক্তিতে সরাসরি যুক্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের মতো এক নাগাড়ে যখন 'হা রে রে রে রে রে' করে চেঁচিয়ে চলেছেন রাহুল গান্ধী, তখনই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মোক্ষম চালটি চেলেছেন, কপ্টার দুর্নীতির অন্যতম মধ্যমণি মিডলম্যান ক্রিস্টিয়ান মিচেলকে দুবাই থেকে গ্রেপ্তার করে ভারতে এনে।

মিচেল বেশ স্পষ্ট করেই ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার চুক্তিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁর পুত্র বর্তমানে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। তা নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট নতুন ভাবে তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ইডি মিচেলের ১.১২ কোটি টাকার ভারতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ দিল্লির সফদরজঙ্গের একটি ফ্ল্যাট। সেখানে অবস্থিত তাঁর গণমাধ্যম সংস্থা মিডিয়া এক্সিম। রয়েছে একটি দামি গাড়ি। এছাড়া ব্যাঙ্কের ৫৪ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট। বাজেয়াপ্ত হয়েছে এস পি ত্যাগীরও ৭ কোটি টাকার হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি। বাকি তথ্যের যবনিকা উত্থাপনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

কিন্তু এখানেই যদি 'খেল খতম' হত, সমালোচনা হতে পারত, বিজেপি খেলছে রাজনৈতিক 'গেম'। কিন্তু এরই মধ্যে যে প্রকাশ্যে এসে গেল আরও এক দুর্নীতি যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নেহরু পরিবারের বংশধররাই যাঁরা স্বাধীনতার পর থেকেই ধরেই নিয়েছিলেন ভারতবর্ষ আসলে তাঁদেরই পৈতৃক সম্পত্তি। নব উন্মোচিত এই দুর্নীতির নামকরণ হতে পারে গান্ধী পরিবারের কর্পোরেট স্ক্যাম।

ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার অফিস।

একথা সুবিদিত যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই ভারতবর্ষের তৎকালীন ভাবী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ন্যাশনাল হেরাল্ড। মূলত কংগ্রেসি ঘরানার এই সংবাদপত্রটি কংগ্রেসের পারিবারিক পত্রিকা হিসেবেই পরিচিত ছিল। সংবাদপত্রটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড বা এ জে এল যেটি নেহরুর উদ্যোগেই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছিল ১৯৩৭ সালের ২০ নভেম্বর। এজন্য দিল্লির ৫/এ, বাহাদুর শাহ জাফর মার্গে (আই টি ও-র কাছেই) তৈরি হয়েছিল বিশাল হেরাল্ড হাউস। মূল উদ্যোক্তা জওহরলাল নেহরু হলেও, এটি কখনই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। কারণ সংবাদপত্রটি জন্ম নিয়েছিল পাঁচ হাজার স্বাধীনতাসংগ্রামীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং আর্থিক দানের সাহায্যে। এই পাঁচ হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামীই ছিলেন ন্যাশনাল হেরাল্ড তথা এ জে এল-এর এক একজন শেয়ারহোল্ডার। কোম্পানির মোট মূলধন ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। সেই টাকা ভাগ করা হয়েছিল একশো টাকা মূল্যের দু'হাজার প্রেফারেন্সিয়াল শেয়ারে এবং দশ টাকা মূল্যের তিন হাজার অর্ডিনারি বা ইক্যুইটি শেয়ারে। কোম্পানির নথিতে সই করেছিলেন নেহরু স্বয়ং, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, আচার্য নরেন্দ্র দেব, রফি আহমেদ কিদোয়াই, কৈলাসনাথ কাটজু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং কৃষ্ণদত্ত পালিওয়াল। চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন মোতিলাল ভোরা। একসময়ে প্রবল প্রতাপশালী রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় ন্যাশনাল হেরাল্ড বেড়ে উঠেছিল নধর হয়েই। কিন্তু নেহরুর মৃত্যু এবং ক্রমশ দুর্নীতির পাঁকে তলিয়ে যেতে থাকা কংগ্রেসের দুর্দিন এসে পড়ায় একসময় ন্যাশনাল হেরাল্ড বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় সহযোগী উর্দু প্রকাশন কাওয়ামি আওয়াজ এবং হিন্দি প্রকাশন নবজীবন। প্রকৃতপক্ষে ২০০৮ সাল থেকেই ঐতিহাসিক হেরাল্ড হাউস সংবাদপত্র বিবর্জিত হয়ে যায়। কিন্তু ততদিনে গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছে এ জে এল-এর বহু সম্পত্তি— নিউ দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, ভোপাল, মুম্বাই, ইন্দোর, পাটনা, পাঁচকুল্লা সহ বহু জায়গায় যার দাম আনুমানিক ৫০ মিলিয়ন টাকা। শুধুমাত্র হেরাল্ড হাউসেই জায়গা রয়েছে দশ হাজার স্কোয়ার মিটার।

কিন্তু সত্যি বলতে কী, ন্যাশনাল হেরাল্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সংস্থাটি সম্বন্ধে মানুষের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অনেকে ভুলেই গিয়েছিল যে ওই নামে একটি সংবাদপত্র ছিল। মানুষের এই ভুলো মনের সুযোগ নিয়েই ২০১০ সালের ২৩ নভেম্বর

কুম্ভ মেলা-২০১৯ উপলক্ষে পূর্ব রেলওয়ের কিছু ট্রেনে অস্থায়ীরূপে কোচ সংযোজন

কুম্ভ মেলা-২০১৯ উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত ট্রেনে অস্থায়ীরূপে কোচ সংযোজন করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্র.	ট্রেন নম্বর	সংযোজন	স্টেশন থেকে যাত্রা শুরুর তারিখ
১	১২৩১৯/১২৩২০ কলকাতা-আগ্রা ক্যান্ট. সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	স্লিপার শ্রেণী-১	কলকাতা থেকে ৯.১.২০১৯ থেকে ৬.৩.২০১৯ আগ্রা ক্যান্ট. থেকে ১০.১.২০১৯ থেকে ৭.৩.২০১৯
২	১২৩৫৭/১২৩৫৮ কলকাতা-অমৃতসর দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	ও এসি ৩টিয়ার-১	কলকাতা থেকে ১২.১.২০১৯ থেকে ৯.৩.২০১৯ অমৃতসর থেকে ১৪.১.২০১৯ থেকে ১১.৩.২০১৯
৩	১৩১৩৫/১৩১৩৬ কলকাতা-জয়নগর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	(নির্দিষ্ট দিনে)	কলকাতা থেকে ১২.১.২০১৯ থেকে ২.৩.২০১৯ জয়নগর থেকে ১৩.১.২০১৯ থেকে ৩.৩.২০১৯
৪	১২৩২১/১২৩২২ হাওড়া-সিএসটিএম মুম্বাই মেল	এসি ৩টিয়ার-১	হাওড়া থেকে ১৮.১.২০১৯ থেকে ১০.৩.২০১৯ মুম্বাই থেকে ২০.১.২০১৯ থেকে ১২.৩.২০১৯
৫	১২৩৩৫/১২৩৩৬ ভাগলপুর-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস	এসি ৩টিয়ার-১ (নির্দিষ্ট দিনে)	ভাগলপুর থেকে ১১.১.২০১৯ থেকে ৫.৩.২০১৯ লোকমান্য তিলক থেকে ১৩.১.২০১৯ থেকে ৭.৩.২০১৯
৬	১২৩৪৯/১২৩৫০ ভাগলপুর-নিউ দিল্লী এক্সপ্রেস	এসি ৩টিয়ার-১	ভাগলপুর থেকে ১৪.১.২০১৯ থেকে ৪.৩.২০১৯ নিউ দিল্লী থেকে ১৫.১.২০১৯ থেকে ৫.৩.২০১৯
৭	১৩৪২৩/১৩৪২৪ ভাগলপুর-আজমের এক্সপ্রেস	(নির্দিষ্ট দিনে)	ভাগলপুর থেকে ১০.১.২০১৯ থেকে ৭.৩.২০১৯ আজমের থেকে ১২.১.২০১৯ থেকে ৯.৩.২০১৯
৮	১২৩৬১/১২৩৬২ আসানসোল-সিএসটিএম এক্সপ্রেস	এসি ৩টিয়ার-১ (নির্দিষ্ট দিনে)	আসানসোল থেকে ১৩.১.২০১৯ থেকে ১০.৩.২০১৯ মুম্বাই থেকে ১৬.১.২০১৯ থেকে ১৩.৩.২০১৯

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অত্যন্ত সংগোপনে সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর তত্ত্বাবধানে জন্ম নেয় একটি নতুন কোম্পানি— ইয়ং ইন্ডিয়ান। ডিরেক্টর রাহুল গান্ধী। বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর সদস্যা শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী। সংস্থার নথিপত্র সরকারিভাবে হাতে আসার আগেই আরও একটা কাজ সেরে নিলেন সোনিয়া ও রাহুল। দলীয় সভানেত্রীর ক্ষমতা খাটিয়ে তিনি এ জি এল-এর নামে কংগ্রেসের দলীয় কোষাগার থেকে ৯০.২৫ কোটি টাকা ঋণ নিলেন। সম্পূর্ণ সুদহীন এবং কোনও শর্ত ছাড়াই। উদ্দেশ্য ছিল, সংবাদপত্রগুলির পুনর্নির্মাণ।

কিন্তু আদপে কী হলো। দেখা গেল রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ইয়ং ইন্ডিয়ান কোম্পানির নামে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের সমস্ত শেয়ার এবং সম্পত্তি ইয়ং ইন্ডিয়ান কোম্পানিতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। যার আনুমানিক আর্থিক মূল্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা। সময় : ২০১১।

কংগ্রেস থেকে ঋণ নেওয়া অর্থ কোথায় গেল, কোন কাজে ব্যবহৃত হলো, তা কিছুই জানা গেল না। কিন্তু ২০১১ সালের ২১ জানুয়ারি আচমকা ঘোষণা করা হলো ইয়ং ইন্ডিয়ান সংস্থা প্রকাশ করবে তিনটি সংবাদপত্রই— ন্যাশনাল হেরাল্ড, কাওয়ামি আওয়াজ এবং নবজীবন।

এবার কিন্তু ফুঁসে উঠলেন সংস্থার অংশীদাররা। তাঁরা প্রকাশ্যে দাবি করলেন, শেয়ার হোল্ডারদের না জানিয়েই অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের শেয়ার ট্রান্সফার করা হয়েছে ইয়ং ইন্ডিয়ান সংস্থায়। এটা এক ধরনের বেআইনি আর্থিক লেনদেন। প্রতিবাদীদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার প্রাক্তন আইনমন্ত্রী শান্তিভূষণ এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজু। তখনই প্রকাশ্যে এল আরও এক মারাত্মক হিসাব। দেখা গেল, ইয়ং ইন্ডিয়ানের ৭৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর নামে। বাকি ২৪ শতাংশের অর্ধাংশ করে রয়েছে মোতিলাল ভোরা এবং অস্কার ফার্নান্ডেজের নামে। আর সংস্থাটি নথিভুক্ত হয়েছে অলাভজনক সংস্থা হিসেবে।

এ তো রীতিমতো দিনে ডাকাতি!

১ নভেম্বর ১০১২, ভারতীয় রাজনীতিতে সাড়া জাগানো চরিত্র সুব্রহ্মণ্যম স্বামী যিনি অদ্ভুত এবং অজানা দুর্নীতির খবর কবর থেকে টেনে বার করে নিয়ে যান আদালতের দোরগোড়ায়। তিনি সরাসরি মামলা দায়ের করলেন দিল্লির মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। তাঁর অভিযোগ, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ১৬ বিলিয়ন টাকা জালিয়াতি করা হয়েছে। এ জি এলের সমস্ত সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়েছেন মা ও ছেলে। একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করে অংশীদারদের ঠকিয়েছেন তাঁরা। এমনকী সরকারের দেওয়া যে জমিতে হেরাল্ড হাউস নির্মিত হয়েছে, তাও পাসপোর্ট অফিসকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকায়। সবটাই দেশের প্রচলিত আইনবিরুদ্ধ এবং এক ধরনের ক্রাইম। শ্রীস্বামী জোর গলায় আওয়াজ তুললেন, ঋণ দেওয়াটা কোনও রাজনৈতিক দলের কাজ নয়। অথচ কংগ্রেস সোনিয়া-রাহুলের মালিকানাধীন একটি সংস্থাকে ৯০ কোটিরও বেশি টাকা ঋণ দিয়েছে বেআইনিভাবে এবং কোনও শর্ত ছাড়াই। অতএব কংগ্রেসের জাতীয় রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি কেড়ে নিতে হবে। ঘোষণা করতে হবে সিবিআই দতন্তেরও।

২০১৪ সালের ২৬ জুন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট গোমতী মানেকা রায় দিলেন, "It appears that young Indian Limited was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use." উদ্দেশ্য অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের ২০০ বিলিয়ন টাকার সম্পত্তি গলাধঃকরণ করা।

আদালতের এই রায় ছিল কংগ্রেস তথা শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের গালে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়ের মতো। কিন্তু তাতেও শিক্ষা হয়নি। রাহুল-সোনিয়া এখন দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। মামলা চলছে।

প্রশ্ন হলো, দেশের মানুষের কাছে তাহলে কে চোর? আর কে চৌকিদার? মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান আর ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর থেকেই রাহুল গান্ধী ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছেন। তাঁর শরীরী ভাষা বদলে গেছে। তিনি মনে করছেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে এগোতে হবে মাত্র কয়েক পা। তারপর অচিরেই মৃত্যু হবে অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড এবং ন্যাশনাল হেরাল্ড নামক চপেটাঘাতগুলির। তিনি ভুলে গেছেন, তিন রাজ্যের জয় নয়, আগামী ভোটে ইস্যু হবে মা-বেটার এই সব কীর্তিকলাপ। শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে ঘুরলেও এসব দুর্নীতির কোনটিকেই কবরের মাটিতে আত্মগোপন করতে দেবে না কেন্দ্রীয় সরকার। ভুলে গেলে চলবে না সেই চরম প্রবাদবাক্যটি— পাপ বাপকেও ছাড়ে না। মানুষের কাছে যখন ভোটভিক্ষা করতে যাবেন, তখন মানুষ প্রশ্ন করবে। জবাব দিতে পারবেন তো? পারবেন তো কালিমালিপ্ত মুখে মানুষের মুখোমুখি হতে? চা-ওয়ালাই বলুন কিংবা চৌকিদার— তাঁর বিরুদ্ধে আঙুল তুলে দাঁড়াবার স্পর্ধা ধরে রাখতে পারবেন তো সেদিন?

কংগ্রেসি রাজনীতির ধারবাহিকতা এটাই। দুর্নীতিতে নিজেকে নিমজ্জিত করে ভালো মানুষ কোনও রাজনীতিবিদকে বলি দেওয়া। নেহরুর জন্য গান্ধীজী বলি দিয়েছিলেন বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার আগেই। আর এখন স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ৭০ বছর পার করে সোনিয়া-রাহুল গান্ধী নিজেদের জন্য বলি দিলেন নিপাট ভদ্রলোক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহকে। কারণ যত দুর্নীতি ঘটেছে, সবই তাঁরই প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে। অথচ তিনি কিছুই জানতেন না। এখন বিরোধীদের চোখে দুর্নীতির নায়ক তিনিই। সাধু সেজে গলাবাজি করছেন 'পাপ্পু' রাহুল গান্ধী।

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা প্রায় শেষের পথে। একবার কালি মেখেছেন মা-বেটা। আবার মাখবেন। আর অগুস্তাওয়েস্টল্যান্ড দুর্নীতি হয়ে উঠবে সোনিয়া-রাহুলের আগ্যস্তযাত্রা। অগ্যস্তওয়েস্টল্যান্ডের পাঁক সর্বস্ব রাজনীতির অতলে তলিয়ে যাবেন তাঁরা— এই ২০১৯-এ। সুদিন সমাগত প্রায়।

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫/৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah

Pin- 711 202

চিঠিপত্র

বর্তমানে বাংলা সংবাদপত্রে এক অশুভ প্রবণতা

দৈনিক সংবাদপত্র বা খবরের কাগজ জনমত গঠনের মাধ্যম। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক জীবনের কোনো বিরূপ এবং বিসদৃশ ভাব ও পরিস্থিতি সঠিক পথে নিয়ে আসে দৈনিক কাগজের সংবাদ পরিবেশনা ও আলোচনা। অতীতে সংবাদজগতে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'Hindu Patriot-এর ভূমিকা আমরা জানি। সাম্প্রতিক অতীতে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বসুমতী' সংবাদজগতে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল! ইংরেজি দৈনিক 'Amrita Bazar Patrika'র অবদানও এ-ব্যাপারে কম নয়! বলতে গেলে বর্তমানে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র পূর্বের ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত। কোনও খবর বা আলোচনাই সুস্থ, সৎ, নীতিনিষ্ঠ চর্চা হয় না! উদ্দেশপ্রণোদিত ভাবে ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠানের বিরূপ সমালোচনা করা হয়! তাদের কাজকর্ম ও নীতিকে যত রকমে পারা যায় ছোটো করে দেখার প্রবণতা আমরা পাঠকরা লক্ষ্য করছি। অনেক প্রকাশিত খবর 'পেড নিউজ' বা 'পয়সা দিয়ে করা'। সত্যের বিন্দুমাত্র চিহ্ন এইসব চর্চায় থাকে না! বলতে গেলে অধিকাংশ সংবাদপত্র বর্তমানে সৎব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মকে বিকৃত সমালোচনার প্রতিযোগিতায় মেতে আছে! সংবাদপত্রের এই অসৎ মানসিকতা সত্যিই বিপজ্জনক। দৈনন্দিন কাগজ পড়া ও চর্চা আজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কেননা যে সংবাদ ও চর্চা পাঠকদের প্রকৃত অর্থে দিক্‌নির্দেশ করে না তাদের মনকে বিদ্বেষ ও হিংসায় ভরিয়ে দেয়, তা সর্বাংশে বর্জ্য, নিন্দনীয় ও অপাঠ্য।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত। গত সাড়ে চার বছরে এই সরকার দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক কল্যাণকর আইন ও কাজের সূচনা করেছে। সবকিছুর ফল এখনই দেখা যাচ্ছে না! ধীরে ধীরে সেইসব ব্যবস্থার সুফল দেশের নাগরিকরা নিশ্চিত পাবেন। এরই মাঝে কিন্তু দেশের দরিদ্র শ্রেণীর প্রায় ছ' কোটি মানুষ বিনামূল্যে গ্যাসের অধিকারী হয়েছে। 'অটল পেনশন যোজনা'র সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী নাগরিকদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েই চলেছে। এরকম আরও অনেক জনকল্যাণকর ব্যবস্থা কেন্দ্রের বর্তমান মোদী সরকার করে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল কাজকর্মের কোনো নীতিনিষ্ঠ আলোচনা ও সমালোচনা দেখা যায় না এই সকল কাগজে। তার বদলে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও শাসক দলের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিরূপতায় ভরে থাকে সংবাদ পরিবেশন ও চর্চা। কোনো লাগাম টানার লক্ষণ নেই! এবার পাঠকদের সচেতন হয়ে এইসব সংবাদ ও চর্চা সম্বন্ধে নিজেদের মত গঠন করতে হবে। আমার নিজের বিশ্বাস এইসব বিদ্বেষপূর্ণ খবর ও চর্চা ভেদ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল আবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'র গতি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ক্ষেত্রে আরও বিপুল ভাবে ছড়িয়ে দেবে।

—রণজিৎ সিংহ,

কলকাতা-৭০০০৩৬।

অমূলক অভিযোগ

'হিন্দু নামে অ্যালার্জি কেন?' শীর্ষক পত্রে, (স্বস্তিকা, ১৬.১১.১৮), অরুণ ঘোড়ই জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের ১২৫তম বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষাদপ্তর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 'স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতামালা এবং পূর্বের ও পরের ঘটনাবলী' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে; পুস্তিকাটির পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ পূর্তিতে বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত 'শিকাগো বক্তৃতামালার' নামে একটি বই থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে অরুণবাবু অভিযোগ করেছেন, রাজ্য স্কুল শিক্ষাদপ্তরের প্রকাশিত পুস্তিকাতে বিবেকানন্দের ভাষণের 'সনাতন' শব্দটি একবার ও 'হিন্দু' শব্দটিকে তিনবার বর্জন করা হয়েছে এবং এই ভাবে আরও আছে। অরুণবাবু মনে করেন, এই কাটছাঁটের পিছনে নিশ্চয়ই একটা অভিসন্ধি আছে।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভায় উক্ত ভাষণে বলেছিলেন—"...পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতি-স্বরূপ, তাঁহার নামে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।"— (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'; প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ পৃ. ৯)। দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দের উক্ত ভাষণে 'সনাতন' শব্দটি আদৌ নেই; এবং 'হিন্দু' শব্দটি তিনবার নয়, একবার বলা হয়েছে। কাজেই, রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের পুস্তিকাতে বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণ কাটছাঁট করা হয়েছে, এই অভিযোগ ঠিক নয়। আদতে, তথ্যবিচ্যুতি ঘটেছে বেলুড় মঠ থেকে প্রকাশিত বইটিতে।

এই প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে ১০, ১২, ১৭ এবং ১৮ নভেম্বর বেদান্ত বিষয়ে চারটি বক্তৃতা করেছিলেন। ওই বক্তৃতামালা 'Practical vedanta' নামে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেখান থেকে জানা যায় যে, ১৮ নভেম্বরের বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন— "...There has not been a religion that has clung to their dualism more than that founded by the Prophet of Arabia and there has not been a religion which has shed more blood and has been so cruel to other men. In the koran there is the doc-

trine that a man who does not believe these teachings should be killed ; it is a mercy to kill him. And the surest way to get to heaven where there are beautiful houris and all sorts of sense-enjoyments, is by killing these unbelievers. Think of the bloodshed there has been in consequence of such belief"–(pp. 98-99)। উক্ত বক্তৃতামালা 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'কর্মজীবনে বেদান্ত' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু সেখানে চতুর্থ দিনের বক্তৃতায় বিবেকানন্দের উপরোক্ত কথাগুলি নেই। পরিবর্তে, 'ছেদচিহ্ন' (...) দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, কিছু কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগাযোগ করেছিলাম। আমার পত্রের উত্তরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছিলেন— স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পুস্তকগুলি ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে রামকৃষ্ণ মঠে ওই পুস্তকাবলীর সম্পাদনার কাজ একটি সম্পাদকমণ্ডলী করেছিলেন। সেই কমিটিতে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও কেউ কেউ ছিলেন ও কাজ করেছিলেন। এবং বলেছেন— আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে তাঁরা ভেবেচিন্তেই এ কাজ করেছিলেন— এই কথাই আমাদের মনে হয়। অতএব উক্ত ব্যাপারে আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় বলে দুঃখিত। অরুণবাবুকে অনুরোধ, তিনি বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের প্রকাশিত 'শিকাগো বক্তৃতামালা' বইতে তথ্যবিচ্যুতির বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য জানুন এবং আমাদের তা জানান।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,** কলকাতা-৬০।

সমাজ বনাম রাজনীতি

তিন তালাক বিল নিয়ে বিরোধী দলগুলো একাকাট্টা হয়ে বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে মরিয়া। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যুগ যুগ ধরে ঘটে চলা তিন তালাক নামক এই অমানবিক, বর্বরোচিত প্রথার হাত থেকে এই দেশের অগণিত মুসলমান মহিলাকে মুক্তি দেবার পথে বিজেপি কোনও দলকেই পাশে পাচ্ছে না। নির্লজ্জ তুষ্টিকরণ যে এই দেশের রাজনীতির মজ্জাগত হয়ে গেছে তা আরও একবার দেশবাসীকে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিল কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলি। এই ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনীতি যা ক্রমেই সংবিধান, সমাজ এমনকী মানবিকতার বুনিয়াদটুকু গ্রাস করে নিয়েছে, তাকে রেখা না গেলে এক ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাবো। তোষণ নামক এই বিকৃতিটি ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটু একটু করে সংযুক্ত হতে হতে আজ মূল স্রোতে পরিণত হয়েছে। আমরা যদি আমাদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে একটা সুস্পষ্ট প্রবণতা আমরা দেখতে পাবো যেখানে একটি ধর্মীয় আগ্রাসনকে খুব সুচতুর ভাবে রাজনীতির মোড়কে এই ভূখণ্ডে বিকশিত হবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রাক্কালে উত্তরপ্রদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের তামাম হিন্দু সিপাহি-সহ সাধারণ মানুষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে নিজেদের সম্রাট ঘোষণা করে ইংরেজ শাসকের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেখানে তারা নিজেদের ধর্মীয় সত্তার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতমাতার সন্তান হিসেবে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এই উদারতা, এই দেশপ্রেমের বিনিময়ে হিন্দুরা কী পেল?

মহাবিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই ধর্মের ভিত্তিতে আস্ত একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা হলো। তারপর প্রথমে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং ধীরে ধীরে দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে এই ভূভাগ খণ্ডিত হলো এবং ইংরেজদের এই উপমহাদেশকে লুণ্ঠন করার কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করা হলো। আর এই সবই হলো কংগ্রেসের ছত্রচ্ছায়ায়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস লখনৌ অধিবেশনে মুসলিম লিগের পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীকে স্বীকৃতি যদি না দিত তাহলে এই দেশের পরবর্তী ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতে পারতো। ধর্মীয় তুষ্টিকরণের যে অঙ্কুরোদগম ১৯১৬ সালে হয়েছিল তাই আজ বিরাট বিষবৃক্ষ হয়ে এই দেশের সমাজ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, এই তুষ্টিকরণের হাত থেকে সংবিধানও রক্ষা পায়নি। আমাদের সংবিধানের চতুর্থভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি সমূহের উল্লেখ আছে। যেখানে এক একটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রকে কী করে কল্যাণকর ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা যায় তার দিক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। যেমন অনুচ্ছেদ চল্লিশে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের কথা বলা হয়েছে, অনুচ্ছেদ ছেচল্লিশে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জনজীবনের উন্নতি সাধনের কথা বলা হয়েছে, অনুচ্ছেদ ঊনপঞ্চাশে আমাদের দেশের প্রাচীন স্থাপত্য সমূহের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের এই ভাগে মোট সতেরোটি অনুচ্ছেদে এইরকম বিভিন্ন সামাজিক, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্দেশগুলিকে রূপায়ণের কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দুটি অনুচ্ছেদকে কখনোই গুরুত্ব দেবার চেষ্টা হয়নি। একটি হলো অনুচ্ছেদ নং ৪৪ যেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলনের কথা বলা হয়েছে আর অনুচ্ছেদ নং ৪৮ যেখানে গোরক্ষার কথা বলা হয়েছে। যে সংবিধান সভার অধিকাংশ সদস্য কংগ্রেসের সেই সংবিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সাংবিধানিক নির্দেশগুলিকে স্বাধীন ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ সময় ধরে শাসনকালে কংগ্রেস শুধুমাত্র উপেক্ষাই করেনি, এগুলি যাতে বাস্তবায়িত না হয় তার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। তাই তিন তালাক নিয়ে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া আঞ্চলিক দলগুলি যে এর বিরোধিতা করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এই তুষ্টিকরণ আর ধর্মীয় আগ্রাসনের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে প্রতিটি দেশবাসীকে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

—**সোমনাথ গোস্বামী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

অঙ্গনা

কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানির প্রতিবিধান

সৌমী দাঁ

বিগত কয়েকদিনে দেশে একটা নতুন শব্দ শিরোনামে এসেছে সেটা হলো # Me Too প্রতিবাদ। সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় পাতায় চলছে হ্যাশট্যাগ 'মি টু' (# Me Too)-এর প্রচার। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলা সে সিনেমা আর্টিস্ট থেকে আরম্ভ করে আটপৌরে গৃহবধূ, বিভিন্ন প্রোফেশনে থাকা মহিলারা জীবনের কোনও না কোনও সময়ে, অফিসের বস, সহকর্মী বা অচেনা কারও দ্বারা শারীরিক অথবা মানসিক ভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, এরকম দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন বয়সের মহিলারা একত্রিত হয়েছেন একটি ছাতার তলায় তা হলো # Me Too।

বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রোফেশনে যুক্ত যেমন অভিনয়, সাংবাদিকতা পেশায় প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বারা যৌন হেনস্তার শিকার হবার পরে মুখ খুলতে শুরু করেছেন দেশের মহিলারা। সে নিয়ে নানা বিতর্কও শুরু হয়েছে। তবে এর মাঝে একটা প্রশ্ন হলো, কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নটা ঠিক কী? এর সংজ্ঞাটা কী?

এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস জানা দরকার সেটা হলো কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত অপরাধের জন্য ২০১৩ সালে একটি আইন পাশ করা হয় তার নাম 'Sexual Harrassment of Women at work place Act 2013'।

এই আইন পাশ হবার আগে পর্যন্ত মহিলাদের যৌন হেনস্থার প্রতিবাদের ও অভিযোগের জন্য বিশাখা নির্দেশিকা ছিল। এই নতুন আইন বিশাখা নির্দেশিকাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

কী এই বিশাখা নির্দেশিকা :

১৯৯৭ সালের আগে পর্যন্ত কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানির জন্য নির্দিষ্ট আইন ছিল না। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হতো। কিন্তু সঠিকভাবে বিচার হয়তো অভিযোগকারিণী পেতেন না।

কিন্তু ১৯৯২ সালে রাজস্থানে একটি ঘটনা ঘটে যা মহিলাদের জন্য বিশাখা নির্দেশিকা আনতে বাধ্য করে। রাজস্থানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। একবার রাজস্থানে এক বছরের এক শিশুর বিয়ে ঠিক করা হয়। গ্রামের মহিলা ভাঁওড়ি দেবী সরকারি চাকরি করতেন এবং গ্রামের এই সমস্ত কুপ্রথা থেকে লোকজনকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করতেন। এই কারণে তিনি গ্রামের কিছু লোকের বিরাগভাজন ছিলেন। ভাঁওড়ি দেবী যখন ওই এক বছরের শিশুর বিবাহে আপত্তি জানান এবং তার পরিবারকে প্রতিহত করতে চান, তখন গ্রামের এক সমাজকর্মীর সহায়তায় ভাঁওড়ীদেবীকে গণধর্ষণ করা হয় তাকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। এরপর ভাঁওড়িদেবী আদালতে অভিযোগ করেন। কিন্তু সুবিচার পান না এবং দোষীরাও শাস্তি পায় না। এই ঘটনার প্রতিবাদ করে একটি সংগঠন গঠিত হয়। সেই সংগঠনটির নামই 'বিশাখা'। সেই 'বিশাখা' অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনার প্রতিবাদে নারী অধিকার ও সুরক্ষার জন্য এবং কর্মক্ষেত্রে যাতে নারীরা সুরক্ষিত ভাবে তাদের মর্যাদা নিয়ে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করতে পারে সেই মর্মে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে সর্বোচ্চ আদালতে। সেই মামলায় সর্বোচ্চ আদালত ১৯৯৭ সালে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার ও সুরক্ষার কিছু নির্দেশিকা দেয়, যা 'বিশাখা নির্দেশিকা' নামে পরিচিত।

নির্দেশিকায় তিনটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নিষেধ (Prohibition), প্রতিরোধ (প্রিভেনশন) এবং প্রতিকার (Redress)। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিকায় জানিয়েছে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থা হলে অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে। ২০১৩ সালের আইন অনুযায়ী ১০ জন কিংবা তার বেশি সংখ্যক কর্মী রয়েছে এমন সংস্থার নিয়োগকর্তার ইন্টারনাল কমপ্লেইন্টস কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক। এই আইনের আওতায় পড়বে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত সবাই। শুধু মহিলা কর্মীই নয়, বিশেষ কোনো কাজে সংস্থায় এসেছেন এমন মহিলাও এই আইন দ্বারা সুরক্ষিত।

যৌন হেনস্থার সংজ্ঞা কী?

(১) শারীরিক ভাবে স্পর্শ এবং তার থেকে বেশি কিছু।

(২) যৌন প্রশ্রয়ের দাবি।

(৩) পর্নোগ্রাফি দেখতে বাধ্য করা।

(৫) যে কোনও মৌখিক, শারীরিক, আচরণগত যৌন হেনস্থা।

(৬) মহিলার যৌনজীবন নিয়ে আজেবাজে প্রশ্ন, মন্তব্য, আপত্তিজনক যৌনতাপূর্ণ এস এম এস, ই-মেইল, হোয়াটস-আপ ছবি বা পোস্টার দেখানো।

(৭) যৌন পক্ষপাত দাবি করে মন্তব্য, হুমকি, তার প্রতিবাদ করলে তার উদ্দেশ্যে যৌন মন্তব্য করা।

(৮) যৌনতার ইশারা বা আমন্ত্রণ।

উল্লিখিত অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণগুলোর মধ্যে যে কোনও একটি ঘটলেই তা কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা হিসেবে গণ্য হবে।

(লেখিকা পেশায় একজন আইনজীবী)

খাদ্য পানীয় গ্রহণে কিছু নিয়ম নীতি

অতিসবরণ আইচ

- দুপুরে খাওয়ার ঘণ্টা চারেক পর ক্ষিদে লাগলে একটা ফল বা ছোলা-বাদাম ভাজা বা চা-মুড়ি বা মুড়ি-শশা বৈকালিক খাদ্য হতে পারে। নারকেল কোড়া বা টুকরো দিয়ে চিড়েভাজা ভালো বৈকালিক স্বল্পাহারে। মাঝে মাঝে ঘুগনি বা ওইজাতীয় খাদ্য খাওয়া যেতে পারে। বৈকালিক যেন খুব ভারী না হয়।
- রাতের খাবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে নিতে পারলে ভালো।
- রাতের খাওয়া আর শোওয়ার মাঝে ১ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টা যদি হয় খুব ভালো।
- রাতে বেশি তেল-মশলাযুক্ত এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য না-খাওয়া ভালো।
- সহজপাচ্য ও কম পরিমাণে রাতের খাবার খেয়ে শোবার আগে এক পোয়ার মতো দুধ খেতে পারলে ভালো।
- দুধ সারাদিনের খাদ্যবিষ নাশ করে। তবে দুধ-রুটি বা দুধ-খই নয়। শুধু দুধ বিষ নাশ করে। দেশি গোরুর দুধ।
- রাতের খাবার হিসেবে দুধ-রুটি বা দুধ-খই খাওয়া যেতে পারে।
- অনেকে বৈকালিক একটু ভারী আহার করেন এবং রাতে কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন না। এই অভ্যেস খুব ভালো।
- যাঁরা রাতে কিছু খাদ্য গ্রহণ করেন না,পরের দিন সাতসকালেই তাঁদের খাওয়া উচিত।
- মল ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।
- প্রভাতী সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যাকালে খাওয়া অনুচিত।
- শ্রান্ত-ক্লান্ত-বিধ্বস্ত অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ চলবে না।
- স্নানের পরে খেতে হবে, খেয়ে স্নান নয়।
- মুখে অনেকক্ষণ রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে খাদ্য খেলে সহজে হজম হয় এবং বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- মেরুদণ্ড টান করে পেট সোজা রেখে খাদ্য খেতে হয়। যাতে পাকস্থলীতে চাপ না পড়ে। মাটিতে বসে মাটিতে ভোজনপাত্র থাকলে স্বাস্থ্যকরভাবে খাওয়া সম্ভব নয়।
- চেয়ার-টেবিলে বা মাটিতে বসে একটু উঁচু জায়গায় পাত্র রেখে খেলে ভালো। স্যালাড খাওয়ার আগে বা পরে, খেতে খেতে নয়।
- খেতে খেতে জল খেলে ১৪০টা রোগ হয়।
- ডান নাকে শ্বাস চলা কালে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।
- খাওয়ার পরে বজ্রাসন করতে পারলে ভালো। খাওয়ার পর চল্লিশ মিনিট পেট টান করে বসতে হয়।
- খেতে খেতে মানসিক চঞ্চলতা সৃষ্টি করে এমন কোনো দৃশ্য দেখা ও শোনা খাদ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
- আমাদের রক্তে ও পেটে অ্যাসিডিটি বেশি আছে। সুতরাং অম্লজাতীয় খাবার বেশি খেলে শরীরে নানা ব্যাধি বাসা বাধবে।
- খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ অ্যাসিডিক ও দুই তৃতীয়াংশ ক্ষার জাতীয় খাবার খেতে হবে।
- অম্ল জাতীয় খাদ্য হলো— মাছ, মাংস, ডিম, ভাত, রুটি, ঘি, মাখন, মিষ্টি, মিঠাই প্রভৃতি।
- ক্ষারজাতীয় অর্থাৎ অ্যালকাহলিক খাদ্য হলো— যতরকম শাকসবজি, সবরকম ডাল, দুধ, দই, ঘোল, টক-মিষ্টি সবরকম ফল, ছোলা, বাদাম, রাজমা জাতীয় খাদ্য।
- রান্না করা খাবার ফ্রিজে রাখলে ফ্রিজ থেকে বের করে আর গরম করা ঠিক নয়। খাদ্য বিষাক্ত হয়ে যায়। নর্মাল টেম্পারেচারে এনে খেতে হয়।
- রান্না করা খাবার ফ্রিজে না রাখলে সেই খাবার অত্যন্ত উচ্চতাপে গরম করে খেতে হয়। নইলে খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে।
- ভোজনান্তে মুখ ধোয়ার সময় ১৫/২০ বার কুলকুচি করতে হয়। চোখে, কানের পিছনে, ঘাড়ে মুখে কপালে জল দিতে হয়।
- দিনে খাবার পর ২০ থেকে ৪০ মিনিট বিশ্রাম ও রাতে খাওয়ার পর ১০ থেকে ১৫ মিনিট পদচারণা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।
- খাদ্য বা পানীয় পরমেশ্বরের প্রসাদ হিসেবে খেতে হবে।
- খাদ্য পরিবেশিত হওয়ার পর উৎসর্গ মন্ত্র উচ্চারণ করে শান্তি তৃপ্তির সাথে খেলে পাচকরস অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।
- যারা সমাজে মহৎ কাজে যুক্ত থাকেন তাদের খাদ্য-পানীয় অনেক কম প্রয়োজন হয়।
- ভোজন নির্বাক হওয়া উচিত। খেতে খেতে কথা বলা উচিত নয়। খেতে খেতে কথা বলা অস্বাস্থ্যকর শুধু নয়, অবৈজ্ঞানিক ও অভব্যতার পরিচায়ক।
- ছাত্র-শিক্ষক, গবেষকরা নিরামিষ খেলে লাভবান হবেন। দুধ, দই, ঘি, মধু, মাখন, ফল, সবজি বিভিন্ন ডাল খাবেন তারা।
- মানুষের শারীরিক গঠন নিরামিষ খাদ্যের উপযোগী। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রই শেষ কথা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

জীবনের শেষ প্রান্তে, যখন শরীর ভেঙে পড়ছে, তখন কামরাজ নাদারকে ডেকে বলেছিলেন নেহরু— 'ইন্দুকে একটু দেখ।' কন্যা ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে এতটাই চিন্তিত ছিলেন নেহরু। কামরাজকে বলা নেহরুর এই একটি কথাই পরিষ্কার করে দেয়, রাজনীতির মঞ্চে নেহরু পরিবারের প্রাধান্য কন্যা ইন্দিরার মাধ্যমে বজায় থাকুক— এমনটি নেহরু বরাবরই চেয়েছিলেন। রাজনীতির জগৎটির সঙ্গে ইন্দিরার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নেহরু স্বয়ং। তবে, পরিণত বয়সেই নেহরু যখন মারা যান, তখনও ভারতীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হননি। তখনও ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর মূল পরিচয়টি জওহরলাল নেহরুর কন্যারূপে, জাতীয় কংগ্রেসের তরুণ একজন নেত্রী রূপেও। কাজেই নেহরুর জীবৎকালের শেষ দিকেই ভারতীয় রাজনীতিতে যে প্রশ্নটি উঠেছিল— নেহরুর পর কে? সেই প্রশ্নের উত্তরে তখনও ইন্দিরার নাম আসেনি। বরং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নাম এসেছিল, মোরারজী দেশাইয়ের নাম এসেছিল। এমনকী এসেছিল কামরাজ নাদারের নামও। কিন্তু ইন্দিরার নাম একটিবারের জন্যও নয়। কিন্তু বংশপরম্পরায় তাঁর পরে কন্যা ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনটিতে কি অধিষ্ঠিতা দেখতে চেয়েছিলেন নেহরু? এর কোনও সহজ জবাব কখনই মিলবে না। কেননা— 'ইন্দুকে একটু দেখ', ধোঁয়াশাপূর্ণ এই বাক্যটি ছাড়া নেহরু আর কোনও ইঙ্গিত দিয়ে যাননি কামরাজকে। নেহরুর প্রয়াণের পর কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পাদের প্রচেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হলেন নেহরুর অপছন্দের ব্যক্তি লালবাহাদুর শাস্ত্রী। শোনা যায়, পিতার অপছন্দের এই ব্যক্তির মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে প্রাথমিকভাবে ইচ্ছুক ছিলেন না ইন্দিরা। কিন্তু জনমানসে একটি ভুল বার্তা যেতে পারে এই ভেবে লালবাহাদুরই মান ভাঙিয়ে ইন্দিরাকে মন্ত্রীসভায় নিয়ে এসেছিলেন। লালবাহাদুরের প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল ছিল স্বল্প সময়ের। মাত্র দেড় বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার পর তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় লালবাহাদুরের। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর রামরাজ এবং নিজলিঙ্গাপ্পারা চাইলেন এমন কেউ প্রধানমন্ত্রীর পদে বসুন যিনি কার্যত কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতৃত্বের হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করবেন। কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পাদের ইচ্ছায় ইন্দিরা বসলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসনটিতে। কিন্তু 'অ্যাকসিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার' হতে চাইলেন না। আসলে কামরাজ এবং নিজালিঙ্গাপ্পারা ইন্দিরাকে বুঝতে ভুল করেছিলেন। বুঝতেই পারেননি নেহরুর এই অসম্ভব রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী কন্যাটি মানসিক গঠনে স্বৈরতান্ত্রিক ছিলেন। শুধু সময় এবং সুযোগের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর ইন্দিরাকে ঘিরে যখন একটি পৃথক ক্ষমতার বৃত্ত গড়ে উঠল, তখনই সরকার এবং দলীয় সংগঠন দুটিকেই নিজের পুরোপুরি কব্জায় নিয়ে আসতে সক্রিয় হয়ে উঠলেন ইন্দিরা। দল এবং সরকারের ভিতর কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পা, সঞ্জীব রেড্ডি, মোরারজী দেশাইয়ের কর্তৃত্ব খর্ব করে তাদের কোণঠাসা করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। কংগ্রেসের এই ওল্ড গার্ডদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যেতেও তাঁর বাধল না। নিজের একটি সমাজতান্ত্রিক, কিছুটা বামঘেঁষা ইমেজ খাড়া করে কংগ্রেসের তরুণ নেতৃত্বকে পাশেও পেয়ে গেলেন ইন্দিরা। সংঘাত এমন জায়গায় পৌঁছল যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কামরাজ-নিজলিঙ্গাপ্পাদের মনোনীত দলীয় প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে নিজের পছন্দের নির্দল প্রার্থী বরাহ বেঙ্কট গিরিকে দাঁড় করিয়ে জিতিয়ে আনলেন। ভেঙে গেল কংগ্রেস। ইন্দিরার নেতৃত্বে নতুন একটি কংগ্রেস জন্ম নিল। এবং তারাই শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল নিজেদের। ইন্দিরার নেতৃত্বে এই কংগ্রেসের নামের সঙ্গে ব্র্যাকেটে যোগ হলো ইন্দিরা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (ইন্দিরা)।

কংগ্রেসের নামের সঙ্গে নিজের নামটি জুড়ে দিয়ে ইন্দিরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেস দলটিকে তিনি নিজের তালুকদারি হিসাবেই চালাতে চান। বস্তুত কংগ্রেস ভাগ হওয়ার ওই

সপরিবারে ইন্দিরা গান্ধী।

সময়টি থেকেই পরিবারতন্ত্র চালু হয়ে গিয়েছিল কংগ্রেসে। নেহরুকে যতই গণতন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হোক না কেন, পরিবারতন্ত্রের প্রতি মোহ যে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁরও ছিল তা বোঝা যায় নিজের কন্যাকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। তবে, এটা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না— এক ধরনের উচ্চবংশীয় উন্নাসিকতা বরাবরই নেহরুর ভিতর কাজ করেছে। ভারতীয় হিসাবেও নিজেকে ভাবতে একান্তই অনীহা ছিল নেহরুর। নেহরু বলেছিলেন, 'দুর্ঘটনাবশত জন্মসূত্রে আমি একজন হিন্দু, সংস্কৃতিগত ভাবে আমি মুসলমান।' নিজেকে প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলার থেকেও 'ব্রিটিশ সরকারের শেষ ভাইসরয়' হিসাবেই পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। দলীয় সংগঠনে এবং মন্ত্রীসভার যাঁরাই নেহরুর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই নেহরুর এই উন্নাসিকতার পরিচয় পেয়েছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখের প্রতি ব্যবহারে নেহরুর এই উন্নাসিকতাই প্রকাশ পেত। লালবাহাদুর তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে নেহরুর এই উন্নাসিক ব্যবহারের কথা বলেও গিয়েছিলেন। তা লিপিবদ্ধও রয়েছে। নেহরুর উদ্ধত অহংকারী ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিও। তবুও নেহরু তাঁর জীবদ্দশায় সংগঠন এবং সরকারকে সম্পূর্ণরূপে নিজের কবজায় আনতে পারেননি। মনে যদি কোনও সুপ্ত বাসনা থেকেও থাকে, তাহলে খোলাখুলি পরিবারতন্ত্র চালু করে পারেননি দলে এবং সংগঠনে। 'ইন্দুকে একটু দেখ'— এই বলেই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছিল নেহরুকে। অবশ্য এর পিছনে একটি বড়ো কারণ ছিল সদ্য স্বাধীন দেশটিতে তখনও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞাবান এমন কিছু ব্যক্তিত্ব সক্রিয় ছিলেন, যাদের কবজায় আনা নেহরুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তদুপরি কংগ্রেসের ভিতরেই তখন অনেকে নেহরু বিরোধী ছিলেন। সর্বতোভাবে তাদের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার সাহস বা উপায় কোনওটিই নেহরুর ছিল না।

খুল্লম খুল্লা পরিবারতন্ত্র ইন্দিরা চালু করলেন তাঁরই সৃষ্ট ইন্দিরা কংগ্রেসে। ততদিনে এই ইন্দিরা কংগ্রেসের ভিতর স্তাবকদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেবকান্ত বড়ুয়ার মতো নেতারা 'ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া' বলছেন। সত্তর দশকের গোড়াতেই ইন্দিরা তাঁর কনিষ্ঠপুত্র সঞ্জয় গান্ধীকে নিয়ে এলেন রাজনীতিতে। দলে এবং সরকারেও, তাঁর পরেই যে সঞ্জয়ের গুরুত্ব এই বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতে দেরি করলেন না। ওই সময়ের দিনগুলি যারা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের কথাতেই জানা যায়, কোনও সরকারি পদে না থেকে সঞ্জয় গান্ধীই হয়ে উঠেছিলেন সরকারের মূল নিয়ন্তা। বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্তই গৃহীত হতো সঞ্জয়ের সঙ্গে আলোচনা করে। সঞ্জয় হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের যুবরাজ। বহু দক্ষ এবং যোগ্য নেতাকে কার্যত উপেক্ষা করে সঞ্জয়কে দলে দু' নম্বর পদটিতে অভিষিক্ত করেছিলেন ইন্দিরা। দেশে জরুরি অবস্থা জারিও করেছিলেন এই সঞ্জয়ের পরামর্শেই। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয়বার ইন্দিরা ক্ষমতায় ফিরে আসার কয়েক মাসের ভিতর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান সঞ্জয় গান্ধী। সঞ্জয়ের প্রয়াণের পর তাঁর সেই শূন্যস্থানটি পূরণ করার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীবকে বেছে নেন ইন্দিরা। অনেকে বলেন, রাজীব আদৌ রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ইন্দিরা তো রাজদণ্ডটি নিজের পরিবারের হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না। অতএব, যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চিত করে রাজীব গান্ধীর রাজনীতির মঞ্চে আগমন।

১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর দুই দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারালেন ইন্দিরা গান্ধী। রাজীব তখন পশ্চিমবঙ্গ সফর করছেন। সংবাদ পেয়ে তড়িঘড়ি পৌঁছে গেলেন দিল্লি। যোগ্যতা এবং দক্ষতার নিরিখে ইন্দিরা মন্ত্রীসভার দু'নম্বর ব্যক্তিত্ব প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য যোগ্য দাবিদার। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রণববাবুর নামও আলোচিত হতে শুরু করেছিল সেই সময়। কিন্তু গান্ধী পারিবারের অনুগ্রহপ্রাপকরা কখনই চাননি রাজদণ্ডটি গান্ধী পরিবার ব্যতীত আর কারও হাতে পড়ুক। যে কারণে রাজীব দিল্লি ফিরতেই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হলো। এবং ভাগ্যের কী পরিহাস, কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে সেই ঘোষণা করানো হলো প্রণববাবুকে দিয়েই। ১৯৮৯-এ আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন রাজীব। কংগ্রেসে আওয়াজ উঠল রাজীবের পরে সোনিয়া। কিন্তু রাজীবপত্নী সোনিয়া সম্মত হননি তাতে। অনেকে এই আচরণের জন্য সোনিয়াকে মহীয়সী বলতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু এই 'মহীয়সী' নারীর সম্মত না হওয়ার পিছনে অন্য কারণ ছিল। কারণ, সোনিয়া বুঝেছিলেন রাজনীতিতে তিনি তখনও অনভিজ্ঞ। তদুপরি, তার একটি বিদেশি পরিচয়। ফলে কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন সোনিয়া। ফলে ইন্দিরা-রাজীবের প্রধানমন্ত্রিত্বের পর দীর্ঘদিন পরে নেহরু-গান্ধী পরিবারের বাইরে দক্ষিণ ভারতের পামুলাপতি বেঙ্কট নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসলেন। নরসিংহ রাওয়ের পর অটলবিহারী বাজপেয়ীর পাঁচবছরের সরকার। অটলবিহারী বাজপেয়ীর এন ডি এ শাসনকাল পেরিয়ে ২০০৪-এ আবার সরকারে ফিরল কংগ্রেস। ততদিনে সোনিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন।

নিজেকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে নিয়ে সীতারাম কেশরীকে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে নিন্দনীয় ভাবে অপসারণ করে সভানেত্রীর পদটি দখল করেছেন। ইউ পি এ জোটের নেত্রী হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবু, ২০০৪-এ প্রধানমন্ত্রীর আসনে সোনিয়া নিজে বসলেন না। কেননা, সোনিয়া বুঝেছিলেন, তার ইতালীয় পরিচয় প্রধানমন্ত্রিত্ব পদের সহায়ক হবে না। অতএব, এমন একজন ব্যক্তিকে বেছে নিলেন তিনি, যাঁর কোনও রাজনৈতিক জনসমর্থন নেই। বরং, অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবেই তিনি পরিচিত। এরকম ব্যক্তি অন্তত প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে নেহরু-গান্ধী পরিবারের বিরোধিতা করতে পারবেন না। অতএব, সোনিয়ার ইচ্ছানুযায়ী মনমোহন সিংহ বসলেন প্রধানমন্ত্রীর আসনে। আর সোনিয়া অপেক্ষা করতে থাকলেন পুত্র রাহুলের জন্য।

২০০৯-এও কংগ্রেস ফিরল ক্ষমতায়। প্রধানমন্ত্রী আবার মনমোহন সিংহ। এবং রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রাহুল গান্ধীর প্রবেশ। এখন এই ২০১৮-য় রাহুল গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি। পরিবারতন্ত্রের যে ধারা ইন্দিরা শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সঞ্জয়, রাজীব, সোনিয়া, রাহুল হয়ে আজও তা প্রবাহিত। এবার যদি প্রশ্ন করা যায়, কংগ্রেসের সঙ্গে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির তফাতটা কোথায়? তার উত্তরটিও খুব সহজ। অমিত শাহের পর বিজেপির পরবর্তী সভাপতি কে হবেন তা আপনি বলতে পারবেন না। কারণ, পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ বিজেপির সভাপতি হতে পারবে না। কিন্তু কংগ্রেসে অনেক আগেই আপনি জেনে গিয়েছিলেন সোনিয়ার পর রাহুল। কারণ, কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রই শেষ কথা। আর এখানেই বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের মূলগত তফাত। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দুর্নীতি ঢাকতেই পরিবারতন্ত্র

ড. জিষ্ণু বসু

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান।' তবে এল স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ সরকার গভর্মেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট লাগু করেছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তাকে সরিয়ে ভারতবর্ষের সংবিধানের উপর স্থাপিত হলো ভারতীয় গণতন্ত্র। আজ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র হলো ভারতীয় সাধারণতন্ত্র। তারপর ৬৯টি বছর কেটে গেছে। পরিণত হয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্র। কিন্তু কোথায় যেন মনের মধ্যে মাঝে মধ্যেই একটা আশঙ্কা উঁকি দেয়— পরিবারতন্ত্র সাধারণতন্ত্রের স্থান দখল করে নিচ্ছে না তো!

কদিন আগেই মার্কিন মুলুকের এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলে বসলেন, আমেরিকাতে যেমন প্রেসিডেন্সিয়াল ডেমোক্রেসি, ব্রিটেনে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি তেমনই ভারতবর্ষে ডাইনেস্টিক ডোমোক্রেসি। এই পরিবারতান্ত্রিক গণতন্ত্রের তকমা লাগার পেছনে বহুদিনের ধারাবাহিক ঘটনা আছে। একটু একটু করে বাংলার শত শত বিপ্লবীর রক্তের বিনিময়ে, পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের অশ্রুভেজা দোপাট্টা আগলে রাখা বোনেদের আত্মত্যাগ এবং মহারাষ্ট্রের আত্মদানের মাধ্যমে আসা স্বাধীনতা ১৯৪৭ সালের পরে যেন একটি মাত্র পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে গেল।

স্বাধীনতার পরে পরেই এই নীতিহীন ক্ষমতাদখল আর ভোগসর্বস্ব জীবন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে নাগপাশের মতো ঘিরে ধরেছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বা বাবাসাহেব আম্বেদকরের মতো দেশভক্ত মানুষদের এই ভোগসর্বস্বতা গভীরভাবে পীড়া দিত। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল। তিনি বাপুজীকে বলেছিলেন, নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি চান। এত দুর্নীতি আর তার ভালো লাগছে না। কিন্তু গান্ধীজীর মৃত্যু পরিস্থিতি পালটে দিল। দেশের মধ্যেকার প্রতিবাদী শক্তিকে দমন করা নেহরুর পক্ষে সহজ হয়ে গেল। দেশের বিপদের সময়ে সর্দার প্যাটেলও নেহরুকে ছেড়ে গেলেন না। বিধাতার এই পরিহাসে ভারতবর্ষের বুকে নেহরু বংশের শিকড় গভীরে প্রবেশ করল। মোতিলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তার ছেলে জওহরলাল নেহরু হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তার মৃত্যুর পরে কন্যা ইন্দিরা গান্ধী হলেন প্রধানমন্ত্রী। ইন্দিরার পরে পুত্র রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধীর ইতালীয় স্ত্রী সোনিয়া হলেন কংগ্রেসের সভাপতি। ইউপিএ-১ ও ইউপিএ-২-তে 'অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার' মনমোহন সিংহকে পরিচালনা করতেন ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। সোনিয়ার কন্যা প্রিয়াঙ্কা রাজনীতিতে খুবই সক্রিয়। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি হয়েছেন রাজীব গান্ধীর পুত্র রাহুল গান্ধী।

বংশের অন্যরাও সময় সময়ে রাজদরবারে আসন অলংকৃত করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর জ্ঞাতি বোনপো অরুণ নেহরু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। ইন্দিরার কাকিমা উমা নেহরু, জওহরলাল নেহরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সাংসদ ছিলেন। রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। তার কন্যা নয়নতারা

১৩৩ বছরে পুরোনো একটি রাজনৈতিক দল কীভাবে একটা মাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারকে জড়িয়ে বেঁচে আছে?... ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের কাছে এ বড়ো বিপদের দিন। শত শহিদের রক্তে রাঙানো ভারতের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র কি এক পরিবারতান্ত্রিক দাসত্বে পরিণত হবে!

সায়গলেরও রাজনীতির আঙ্গিনায় ছিল অবাধ যাতায়াত। ভারতবর্ষে নেহরু পরিবারের নামে রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ যোজনা থেকে ইন্দিরা বিকাশ পত্র পর্যন্ত ১২টি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প আছে। রাজীব গান্ধী আবাস যোজনা থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধী নিরাধার যোজনা পর্যন্ত মোট ৫২টি রাজ্য সরকারি প্রকল্প আছে। জওহরলাল নেহরু হকি টুর্নামেন্টের মতো ২৮টি ক্রীড়াপদক/ট্রফি আছে এই পরিবারের নামে। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স, কোচির রাজীব গান্ধী ব্যাডমিন্টন ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মতো ১৯টি স্টেডিয়াম আছে। ৩টি বিমানবন্দর ও ২টি সমুদ্রবন্দর আছে এই পরিবারের নামে। মোট ৪১টি পুরস্কার আছে এই পরিবারের নামে। ১৫টি মেধাবৃত্তি দেওয়া হয় এই নেহরু গান্ধী পরিবারের নামে। ১৫টি জাতীয় পার্ক, অভয়ারণ্য বা মিউজিয়াম আছে এই পরিবারের নামে। ৩৯টি হাসপাতাল বা বড়ো চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র এইসব নামে সরকারি অর্থে তৈরি হয়েছে। ৩৭টি সংস্থা, পদ (চেয়ার) বা উৎসবের নামকরণ হয়েছে এই পরিবারের নামে। ৭৪টি রাস্তা বা সরকারি ভবনের নামকরণ হয়েছে নেহরু, ইন্দিরা বা রাজীব গান্ধীর নামে। মজার ব্যাপার হলো, জওহরলাল নেহরুর পরে এই পরিবারের আজ পর্যন্ত কেউ স্নাতকস্তরের চৌকাঠ পার হতে পারেননি। কিন্তু ওঁদের নামেই ৯৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা জাতীয় শিক্ষা সংস্থার নামকরণ হয়েছে!

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মানুষের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। এক একটি পরিবার নিজেদের নিঃশেষ করে দিয়েছিল দেশের সেবায়। সেই মানুষগুলোকে ভোলাবার কাজ হাতে নিয়েছিলেন নেহরু। মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে আজ পরিষ্কার যে ভারতের স্বাধীনতার পরেও বেঁচে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সেকথা বিলক্ষণ জানতেন নেহরু। নেহরু তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্ব শাহনাওয়াজ খানদের মাধ্যমে চালিয়েছেন। বদলে শাহনওয়াজ পেয়েছিলেন মন্ত্রিত্বের পুরস্কার। নেতাজীর বুকের রক্ত জল করে আই এন এ-র জন্য সংগৃহীত ধনরাশি ভারতে এনেছিলেন নেহরু। তিনটি ট্রাঙ্ক ভর্তি বিপুল ধনরাশি কোনোরকম কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ছাড়াই ভারতে আনলেন এক আইসিএস সি আর দামলে। পুরস্কার হিসাবে দামলেকে দু'দুবার গোয়ার রাজ্যপালের পদ দেওয়া হয়েছিল। এইরকম ভাবে সম্পূর্ণ অসাধু উপায়ে এই পরিবার বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেছে বিগত পাঁচ দশক ধরে। আজ ন্যাশনাল হেরাল্ডের মতো চোখে ধুলো দেওয়া সংস্থার মাধ্যমেই এই পরিবার পাপের ধন লুকোনোর চেষ্টা করছে। সেই জন্যই আয়কর দপ্তর আর এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের সঙ্গে এত লুকোচুরি খেলা, তার পেছনে আছে তিন প্রজন্ম ধরে সংগৃহীত পাপের ধনরাশি। কেন্দ্রে এই পরিবারের বশংবদ কেউ না থাকলেই বিপদ। তাই ক্ষমতাতে থাকা এই পরিবারের জন্য একান্ত আবশ্যক।

গত শতাব্দীর আটের দশকে এই পরিবার আরও একটা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। রাজীব-অট্টাভিও কোয়াত্রোচ্চি। গান্ধী আর কোয়াত্রোচ্চি পরিবারের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে একবাড়ির রান্নাকরা পাস্তা অন্য বাড়িতে যেত। দুই বাড়ির বাচ্চারা একসঙ্গে বড়ো হয়েছে। সেই সুবাদে কোয়াত্রোচ্চি ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রণাসভায় সাউথ ব্লকে অবাধে যাতায়াত করতো। কোয়াত্রোচ্চির কোম্পানি স্নামপ্রোজেক্টটি একের পর এক সার বানানোর মেশিন বিক্রি করতে থাকে। এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন রাজীব গান্ধী। তখন কোয়াত্রোচ্চির সোনায় সোহাগা। ১৯৮৭ সালে সুইডিস রেডিয়ো সম্প্রচার করে যে বোফর্সে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। গান্ধী পরিবার প্রথম থেকেই কোয়াত্রোচ্চিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। ১৯৯৩ সালের ৩০ জুলাই গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ভদ্রলোক দিল্লি ছেড়ে কোয়ালালামপুরে যাত্রা করেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, নরসিমারাও সরকারকে সোনিয়া গান্ধী এই ছাড় দিতে বাধ্য করেছিলেন। ১৯৯৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির এনডিএ সরকারে এলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইন্টারপোলকেও নিযুক্ত করা হয়। কোয়াত্রোচ্চি আর তার স্ত্রী মারিয়া কোয়াত্রোচ্চির লন্ডনের বি এস আই এজি ব্যাঙ্কে 5A5151516M আর 5A515156L দুটি অ্যাকাউন্ট চাকুরিজীবী ব্যক্তির হিসাব বহির্ভূত আয়ের জন্য ইন্টারপোলের সন্দেহ তালিকায় আসে। অর্থাৎ এই পরিবার কেবল দেশের মধ্যেই টাকা রাখেনি দেশের টাকা বিদেশে পাঠানোরও ব্যবস্থা করেছে।

ভারতের আকাশে সেই কালো মেঘ নতুন করে ঘনিয়ে এলেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। ১৩৩ বছরে পুরোনো একটি রাজনৈতিক দল কীভাবে একটা মাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারকে জড়িয়ে বেঁচে আছে? সব প্রবীণ নেতা, এত শিক্ষিত অধ্যাপক, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী এক পরিবারতন্ত্রের কায়েমি স্বার্থের কাছে আত্মনিবেদন করেছে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের কাছে এ বড়ো বিপদের দিন। শত শহিদের রক্তে রাঙানো ভারতের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র কি এক পরিবারতান্ত্রিক দাসত্বে পরিণত হবে!

সর্বভারতীয় ভাবে পরিবারতন্ত্রের এই ধারা রাজ্যে রাজ্যেও গণতন্ত্রের বদলে পরিবারতন্ত্রের জায়গাই প্রশস্ত করছে। শাস্ত্রমতে মানুষের পতনের তিনটি মূখ্য কারণ, তা হলো, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। মানে পুত্র বা পরিবারের জন্য অন্ধ পক্ষপাতিত্ব। সম্পত্তির লোভ আর যশের আকাঙ্ক্ষা। তাই রাজ্যেও যখন দেখা যায় যে কোনো সফল রাজনীতিকের সন্তানসন্ততি, ভাগনে বা ভাইপো কেবলমাত্র পরিবারের সদস্য হওয়ার সুবাদে দলের নেতৃত্ব পাচ্ছে, ক্ষমতার অলিন্দে এসে যাচ্ছে--- কোনো রাজনৈতিক লড়াই, গণ-আন্দোলনের মধ্যে থেকে না উঠেও দলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠছেন তখনই ভয় লাগে। ভয়টা এই কারণে নয় যে সন্তান বা ভাইপো সোনার চামচ মুখে নিয়ে বড়ো হচ্ছে। শহরের বুকে কোটি কোটি টাকা স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করছে, চলমান সিড়ি বা রুপোয় বাঁধানো আসবাবের ঐশ্বর্য তার বিনা ক্লেশে হস্তগত হচ্ছে। ভয়টা সেখানেই যে গণতান্ত্রিক ভারতে গণতন্ত্র মরে যাচ্ছে, স্থান করে নিচ্ছে পরিবারতন্ত্র! ■

গান্ধী পরিবারের কৌশলী পরিকল্পনায় বিস্মৃত ফিরোজ গান্ধী

চন্দ্রভানু ঘোষাল

পাঁচ বছর আগেকার কথা। নরেন্দ্র মোদী সবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। সেই সময় বিবিসি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। যার প্রতিপাদ্য বিষয় : প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হলে ভারতকে পরিবারতন্ত্রের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বস্তুত স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের জাতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনীতির রাশ থেকে গেছে কয়েকটি পরিবারের হাতে। সংখ্যায় অনেকগুলো হলেও দেশের সব থেকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়বে গান্ধী পরিবারের কথা। পরিবারটির মাত্রাহীন ক্ষমতালিপ্সার কথা। এবং এমন এক মানুষের কথা যিনি এই পরিবারের প্রথমপুরুষ হলেও এখন প্রায় বিস্মৃত। ক্ষমতার লোভে অন্ধ তাঁর পরিবারই তাঁকে মনে রাখতে চায়নি।

মানুষটির নাম ফিরোজ গান্ধী। চল্লিশের দশকের ডাকাবুকো নেতা। প্রেম ও পরিণয় সূত্রে ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী এবং রাজীব ও সঞ্জয়ের বাবা। অবশ্যই তিনি গান্ধী পরিবারের প্রথম পুরুষ। কিন্তু পরিবারের বর্তমান সদস্যদের কাছে সম্পূর্ণতই উপেক্ষার পাত্র। সেই উপেক্ষা এমনই যে পরিবারের কেউ তাঁর জন্মদিনে সমাধিতে গিয়ে একটা মোমবাতি জ্বেলে আসার কথাও ভাবতে চান না। তাই বলে কি তারা একেবারেই যান না? অবশ্যই যান। নিজেদের স্বার্থে যান। যেমন রাহুল গান্ধী ২০১১ সালে গিয়েছিলেন। কারণ তার পরের বছরেই (২০১২) উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন ছিল। এর আগে ২০০৮ সালে রাহুল প্রথম যান। সেবার তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন ফিরোজ গান্ধীর ভাই ফারদিউন। শ্বশুরমশাইয়ের সমাধি দেখার জন্য সোনিয়া গিয়েছিলেন ২০০১ সালে। সমাধিস্তম্ভের ভগ্নদশা দেখে উদ্বেগও প্রকাশ করেন। এই ঘটনার চার বছর পর সমাধিস্তম্ভ সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন সোনিয়া। কিন্তু সেই টাকা আজ অবধি এসে পৌঁছয়নি!

প্রশ্ন উঠতে পারে এই সর্বাঙ্গীণ উপেক্ষা কেন? দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিবারতন্ত্র কায়েম করা যে-দলের উদ্দেশ্য, তাদের শীর্ষে অবস্থানকারী পরিবারটির প্রথম পুরুষ কি তার আপনজনেদের কাছ থেকে একটু সম্মান আশা করতে পারেন না? বস্তুত ফিরোজ গান্ধী কংগ্রেসের নেতা হলেও মূলধারার নেহরুবাদী রাজনীতির সঙ্গে কখনও আপোশ করেননি। নেহরুর জমানায় সংঘটিত আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে বহুবার মুখ খুলেছেন। সেই সময় সেসব দুর্নীতি ছিল মুখ্য তার মধ্যে দুটির নাম করা যেতে পারে— মুন্দ্রা কেলেঙ্কারি এবং ডালমিয়া-জৈন কেলেঙ্কারি।

মুন্দ্রা কেলেঙ্কারি নিয়ে সংসদীয় বিতর্কে ফিরোজ গান্ধী তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন এই ভাবে : 'আমার মনের মধ্যে আজ বিদ্রোহের তুফান জেগে উঠেছে। দুর্নীতি যখন এই পর্যায়ে পৌঁছয় তখন মুখ বুজে থাকাকে আমি দেশদ্রোহিতা বলে মনে করি।... (ফিরোজ গান্ধী— আ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি, লেখক শশীভূষণ)। এই বই থেকেই জানা যাচ্ছে, হরিদাস মুন্দ্রা নামে এক ব্যবসায়ী জীবন বিমা কর্পোরেশনকে তার নামগোত্রহীন সংস্থার শেয়ার চড়া দামে কিনতে বাধ্য করেন। তখন অর্থমন্ত্রী টি.টি. কৃষ্ণমাচারী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফিরোজ গান্ধীর আন্দোলনের ফলে জনরোষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অর্থমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। ডালমিয়া-জৈন কেলেঙ্কারিতেও তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল সারা দেশ। ফিরোজ গান্ধী প্রয়োজনীয় নথিপত্রের মাধ্যমে সংসদকে জানান, ডালমিয়া এবং জৈন গ্রুপের দুই মালিক গোয়ালিয়র ব্যাঙ্ক ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানি তছরূপ করে সেই টাকায় বেনেট অ্যান্ড কোলম্যান নামের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্থাটি সংবাদপত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কর্পোরেট দুর্নীতির পরিসরে ফিরোজ গান্ধী বিড়লা গোয়েঙ্কা— কাউকে ছাড়েননি। তিনি ছিলেন পার্শী মুসলমান। সুতরাং টাটাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত থাকলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু জীবনে কখনও কারও প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্ব করেননি। সেই সময় টাটাদের সংস্থা টেলকো রেলইঞ্জিন তৈরি করত। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন টেলকো বাজারদরের থেকে অনেক বেশি দামে ইঞ্জিন বিক্রি করে। তার জন্য ভারতীয় রেলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রসঙ্গটি তিনি সংসদে উত্থাপন করলেন। তাঁর সমর্থনে দেশজুড়ে জনমত গড়ে উঠল। নেহরু বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে ইঞ্জিন কেনা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে ফিরোজ গান্ধী একাধিকবার নেহরুর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে তার মৃত্যুর পর গান্ধী পরিবার যে তাঁর প্রতি চূড়ান্ত উদাসীনতা এবং অবহেলা প্রদর্শন করেছে, তার অন্যতম কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে তাঁর এহেন আস্থা ও নেহরুর ঈশ্বরত্বে ঘোর অবিশ্বাস। তবে কারণ একটা নয় একাধিক। আরেকটি অন্যতম প্রধান কারণ ফিরোজ গান্ধীর ধর্ম। তাঁর বাবা ছিলেন মুসলমান, নাম নবাব খান। মা ছিলেন পার্শী। মায়ের পদবি ছিল গ্যান্ডি। সেই হিসেবে তিনি পার্শী মুসলমান। নাম লিখতেন ফিরোজ খান গ্যান্ডি। (সূত্র : www.asiasource.org/society/indira gandhi.cfm)। কিন্তু ইন্দিরাকে বিয়ের সময় নেহরু আপত্তি করলেন। এই অসবর্ণ বিবাহ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের কাছে ভুল বার্তা যাবে। তাহলে উপায়? এগিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধী। দত্তক নিলেন ফিরোজকে। তাঁর নতুন নাম হলো ফিরোজ (খান) গান্ধী। যাই হোক, বিয়ে তো হলো। সংসারযাত্রাও মোটামুটি সম্পন্ন হলো। কিন্তু মৃত্যুর পর কংগ্রেসের মূলধারার রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেলেন ফিরোজ গান্ধী। ইন্দিরা চাননি ফিরোজ থাকুন। তাতে হিন্দু-মুসলমান সমীকরণের অঙ্কে গোলমাল হয়ে যেত। এখনও সেই ট্র্যাডিশন চলছে। যতদিন কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রের আধিপত্য থাকবে ফিরোজ আড়ালেই থেকে যাবেন।

গুজরাটে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

গত ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর গুজরাটের অমেদাবাদ শহরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৬৪ তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন সম্পন্ন হয়। অধিবেশনে সারা দেশ থেকে ২৫৮ জন অধ্যাপক ও ৭৬৬ জন ছাত্রী-সহ ৩৭৪৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৩ জন ছাত্রী-সহ ১৩৩ জন অংশগ্রহণ করেন। নেপাল, সিকিম ও আন্দামান থেকেও প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের অখিল ভারতীয় সভাপতি ড. এস সুব্বাইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক আশিস চৌহান পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ইসরোর পূর্বতন অধ্যক্ষ পদ্মশ্রী ভূষিত এসএস কিরণ কুমার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ভাই রুপানী ছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, গুজরাটের রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ কোহ্‌লি, উপমুখ্যমন্ত্রী নীতীন প্যাটেল, শিক্ষামন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংহ চূড়াসমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শ্রীনাইডু যশবন্তরাও কেলকর যুবা পুরস্কার স্বরূপ একলক্ষ টাকা ও মানপত্র তুলে দেন সন্দীপ যোশীর হাতে।

অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় সভাপতি ও রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ডাক্তার এস সুব্বাইয়া ও আশিস চৌহান পুনরায় নির্বাচিত হন। সহ সভাপতি হিসেবে রাজস্থান থেকে অধ্যাপক আনন্দ পালিওয়াল, গুজরাট থেকে ছগনভাই প্যাটেল, গোরখপুর থেকে উমা শ্রীবাস্তব, মহীশূর থেকে বসন্ত কুমার এবং বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন রাজ্য সভাপতি ডাঃ রমণ কুমার ত্রিবেদী মনোনীত হন। রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক হিসেবে সুনীল

দাড়িভিটের ঘটনায় নিহত ছাত্রদের পরিবারকে সংবর্ধনা।

উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. বিক্রম সারাভাইয়ের নামে অধিবেশন স্থলের নামকরণ হয়।

অধিবেশনে তিনটি প্রস্তাব এবং দুটি সংকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব তিনটি হলো, (১) দেশের মানুষের আস্থা ও পরম্পরার বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, (২) ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার পথে চ্যালেঞ্জ এবং (৩) স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থার সুলভ সমাধান। এছাড়াও অন্য একটি প্রস্তাবে বলা হয় 'শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মাওবাদী অভিসন্ধি দূর করতে হবে।' সংকল্প দুটি হলো, (১) নারী সম্মান আমাদের আত্মশ্রদ্ধা এবং (২) সুবর্ণ ভবিষ্যতের জন্য ভোটদান করা।

অধিবেশনে সমস্ত রাজ্যের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের ৩৬ তম রাজ্য সম্মেলনে ২০১৮-১৯ বর্ষের নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি হিসেবে সুদীপ্ত মুখার্জি এবং রাজ্য সম্পাদক হিসেবে সপ্তর্ষি সরকার পুনরায় নির্বাচিত হন। অধিবেশন ১০টি সমান্তরাল সত্র অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাষ্ট্রীয় সমস্যার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। অধিবেশনের মূল মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিট হাইস্কুলের ঘটনায় নিহত ছাত্র রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের বাবা-মা বোন এবং গুলিতে আহত ছাত্র বিপ্লব সরকারকে সম্মান জানিয়ে রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং সিবিআই তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যার্থী পরিষদ আন্দোলন জারি রাখবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। অধিবেশনে আগত সাংগঠনিক ৩৯ টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাঁদের পরম্পরাগত পোশাকে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রা শেষে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত আম্বেকর, রাষ্ট্রীয় সহ সংগঠন সম্পাদক হিসেবে কে এন রঘুনন্দন, জি লক্ষ্মণ, শ্রীনিবাস এবং প্রফুল্ল আকরান্তের নাম ঘোষিত হয়। পূর্ব ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক হিসেবে ওড়িশার গোবিন্দ নায়েক এবং পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক হিসেবে অপাংশুশেখর শীল ও সহ সংগঠন সম্পাদক হিসেবে বয়লোচন সাহুর নাম পুনরায় ঘোষিত হয়। সমগ্র রাজ্যের সম্মেলন সহ ৪ হাজার কার্যকর্তার দায়িত্ব ঘোষণা করা হয় এই অধিবেশনে।

ALWAYS EXCLUSIVE
NR Vandana ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

ব্যারাকপুরে পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর ৭৫ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

'ভারতীয় সৈনিকদের কাছে দেশ একটুকরো জমি বা ল্যান্ড নয়, দেশ তাঁদের কাছে মাদারল্যান্ড— মাতৃভূমি। স্বদেশের সুরক্ষা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সৈনিকরা আত্মবলিদান দিতে সর্বদা প্রস্তুত। সৈনিক কখনও ভূতপূর্ব হন না— অভূতপূর্ব অর্থাৎ শহিদ হন।' গত ৬ জানুয়ারি পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের সৈনিক অডিটোরিয়ামে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ৭৫ তম বর্ষপূর্তি ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ৪৮ তম বিজয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে এভাবেই কথাগুলি বললেন পরিষদের রাষ্ট্রীয় মার্গদর্শক ইন্দ্রেশ কুমারজী। ইন্দ্রেশজী ছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন অবসর প্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার দণ্ডা, কর্নেল ভাদুড়ি, কর্নেল শ্রীবাস্তব, কর্নেল মিত্র ও ড. জিষ্ণু বসু। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এয়ার ভাইস মার্শাল এইচ পি সিংহ। অনুষ্ঠানে শহিদ ক্যাপ্টেন শেখর ঘোষের পিতা-মাতা সহ আরও ৫ টি শহিদ পরিবারকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

মালদায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পরিবার প্রবোধনের সভা

গত ৫ জানুয়ারি মালদা শহরে পুড়াটুলির শ্যামাপ্রসাদ ভবনে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে পরিবার প্রবোধনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ সুনীতা হলদেকর এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে আদর্শ পরিবারের রূপরেখা, পুরনো দিনের একান্নবর্তী ভারতীয় পরিবার এবং বর্তমান দিনের নিউক্লিয়াস পারিবারের তুলনামূলক আলোচনা করেন। সভায় শতাধিক দম্পতি উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধমানের গলসীতে পরিবার প্রবোধনের সভা

গত ৫ জানুয়রি পশ্চিম বর্ধমান জেলার গলসী খণ্ডের সারুল গ্রামে পরিবার প্রবোধনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বর্তমান সঙ্কটময় ভারতবর্ষে প্রতিটি পরিবারের কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পরিবার প্রবোধনের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র। সভা পরিচালনা করেন পরিবার প্রবোধনের গলসী খণ্ড প্রমুখ সপ্তর্ষি মণ্ডল।

ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের ‘পর্ব ভারতীয়ম্’ উদ্‌যাপন

বিদায় নিয়েছে ২০১৮। বিদায় লগ্নটি স্মরণীয় করে রাখতে কলকাতা সল্টলেকের ভারতীয়ম্ কালচারাল মাল্টিপ্লেক্সে গত ২৪,২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর সাড়ম্বরে পালিত হয়

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক অনুমোদিত ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে সংগীত ও নৃত্যের উৎসব ‘পর্ব ভারতীয়ম্’। উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী অলকা কানুনগো। তিনদিনের উৎসবে ওড়িশী ও মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন ডোনা গাঙ্গুলি ও বিম্ববতী দেবী। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন পণ্ডিত ধনঞ্জয় হেগড়ে। তবলায় সংগত করেন পণ্ডিত রঘুনাথ নাকোড় এবং হারমোনিয়ামে হিরন্ময় মিত্র। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত অভিষেক লাহিড়ী ও ওস্তাদ রফিক খানের সরোদ-সেতার যুগলবন্দি। শিল্পীদের তবলায় সংগত করেন যথাক্রমে পণ্ডিত অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত সুব্রত ভট্টাচার্য। উৎসবের শেষ দিনে হয় লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান। রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও কর্ণাটকের নৃত্যশিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনদিনের উৎসবে কোনও টিকিটের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। শ্রোতাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

সুন্দরবনে বুদ্ধিজীবী নাগরিক মঞ্চের আলোচনা সভা

গত ৬ জানুয়ারি সুন্দরবনের গোসাবার রাঙাবেলিয়া টেগোর সোসাইটি হসপিটালের প্রেক্ষাগৃহে ‘সুন্দরবন বুদ্ধিজীবী নাগরিক মঞ্চ’ এবং ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন সমিতি’র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও লেখক ড. মোহিত রায়, অধ্যাপক পার্থ বিশ্বাস ও অধ্যাপক মনোরঞ্জন জোদ্দার। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষক প্রশান্ত মণ্ডল। অধ্যাপক বিশ্বাস বলেন, রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিবের মতো বামপন্থী চিন্তাচেতনার ঐতিহাসিকরা সুপরিকল্পিত ভাবে দেশভাগের প্রকৃত ইতিহাস দেশের মানুষকে জানতে দেনি। পশ্চিমবঙ্গে স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদের রহস্যময় মৃত্যুর সত্য উদ্‌ঘাটন না করে পশ্চিমবঙ্গ ও হিন্দু বাঙ্গালির প্রতি জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস চরম বেইমানি করেছে। ড. মোহিত রায় এনআরসি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য বর্তমান মোদী সরকারের প্রশংসা করেন। অধ্যাপক জোদ্দার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সন্ত্রাস ও তোষণনীতির দিকগুলি তুলে ধরেন। সভা পরিচালনা করেন শিক্ষক সৈকত মণ্ডল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিক্ষক উৎপল মণ্ডল।

মাথাভাঙ্গায় পরিবার প্রবোধনের বনভোজন

গত ৬ জানুয়ারি পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে পশ্চিম কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় পারিবারিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। বনবোজনে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ পারিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তা। সভা পরিচালনা করেন জেলা সংযোজক অভিজিৎ রায়।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পরিচিতি বর্গ

গত ৫-৬ জানুয়ারি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির হুগলী জেলা পরিচিতি বর্গ অনুষ্ঠিত হয় চুঁচুড়ার প্রতাপপুর প্রণব কন্যা আশ্রমে। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৫১ জন সেবিকা বর্গে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী সত্রে আশীর্বচন প্রদান করেন প্রণব কন্যা আশ্রমের পূজ্যা অমৃতানন্দময়ী মাতা।

বর্গে শারীরিক ও বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন সমিতির পূর্ব ক্ষেত্রের সম্পর্ক প্রমুখ ঋতা চক্রবর্তী, প্রান্ত কার্যবাহিকা শ্রীমতী মৌসুমি কর্মকার, প্রচারিকা নমি সরকার, সমাজ সেবা ভারতীর রাজ্য সম্পাদিকা মুনমুন ঘোষ, হুগলী জেলা কার্যবাহিকা কাকলি রায় প্রমুখ।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

পরম্পরা

মণীন্দ্রনাথ সাহা

এলগিন রোডের বাড়ি থেকে অন্তর্ধানের পর আফগানিস্তান, জার্মানি হয়ে সব শেষে জাপানে গিয়ে একের পর এক চমক সৃষ্টি করে বিশ্বকে যিনি তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্নেহের সুভাষকে দেশনায়ক পদে অভিষিক্ত করে বলেছিলেন— 'দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে। যেহেতু কোনও পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মাননি।' তারপর তিনি আহ্বান করেছিলেন তাঁর পাশে সমস্ত দেশবাসীকে দাঁড়াতে। সে অবকাশ ভারতবাসী না পেলেও দেশান্তরী নেতাজী সুভাষের পাশে দাঁড়িয়েছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রবাসী লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী। সেদিন পাশে থেকে সমর্থন জানিয়েছিল বিশ্বের এগারটি স্বাধীন দেশ।

বিশ্বের এগারোটি রাষ্ট্রপ্রধানের স্বীকৃতি নিয়ে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে প্রবাসে গড়ে উঠল আজাদ হিন্দ সরকার। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর হাজার হাজার জনতার সামনে ঈশ্বরের নামে শপথ নেন যে, তিনি চিরকাল ভারতের সেবক হয়ে আটত্রিশ কোটি ভাই-বোনের কল্যাণ সাধনে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করবেন। সেদিন সিঙ্গাপুরের স্থানীয় সময় ছিল বেলা সাড়ে ১০টা। তার দেড়ঘণ্টার প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন তিনি।

নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যখন একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছেন, তখন নেতাজীর বিরুদ্ধে তৎকালীন কমিউনিস্টরা যে ন্যক্কারজনক আচরণ করেছে তা অকল্পনীয়। বিশেষ করে সিপিআই-এর মুখপত্র 'পিপলস ওয়ার'-এ লেখা হয়েছিল— 'বিশ্বাসঘাতক বোস কোনওদিন বাংলার সোনার মাটি স্পর্শ করতে পারবে না। ...আগস্টের ৯ তারিখ উদযাপন করার অর্থই হলো পঞ্চমবাহিনীকে উৎসাহ দেওয়া'। সিপি যোশী লিখেছিলেন— 'ভারতের স্বাধীনতার এক নম্বর বিশ্বাসঘাতক। তিনি তোজোর আশীর্বাদ নিয়ে ভারতকে আক্রমণ করে স্বাধীনতা চান'। আরও আছে— 'বোস এখন আপনি ফ্যাসিস্তদের ছুটন্ত কুকুর (running dog), তিনি ফ্রাঙ্গের পার্টেন, নরওয়ের কুইসলিং, চীনের ওয়াং চিয়াংওয়েই-এর মতো বিশ্বাসঘাতক।' কোনও ফ্রন্টেই বিশ্বাসঘাতকরা থেমে থাকেনি। এছাড়া পিপলস ওয়ারের বহু সংখ্যায় নেতাজী সম্পর্কে কুৎসিত কার্টুন আঁকা হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস কোনও ধারাকেই স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের বিষয়ে বিস্তারিত জানার পর নেতাজী সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন, "সুভাষ ইতিহাস পুরুষ, তাঁর কথা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।" "His unique achievements would Surely immortalize him in the page of History." তিনি আরও বলেন, "The Hyprotism of the INA has cast its spell upon us." ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর সুভাষের এক পত্রের উত্তরে গান্ধীজী লেখেন— "তুমি সুস্থ থাকো আর অসুস্থই থাকো, তুমি অপ্রতিরোধ্য"।

নেতাজী যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়েছেন, তখন প্রবাসী বাঙ্গালিরা কোটি কোটি টাকা, মেয়েরা গায়ের অলঙ্কার খুলে দিয়েছিলেন। সেগুলি রাখা ছিল ১৮টি বড়ো বড়ো ট্রাঙ্কে। শোনা যায়, তাঁর তথাকথিত মৃত্যুর ঘটনা সাজিয়ে পরে সেই বিপুল অর্থ নাকি ভাগাভাগি হয় ব্রিটিশ সরকার ও নেহরুর মধ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করলে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনার কথা জাপানের এক সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে ঘোষণা করিয়ে আত্মগোপন করেন। তখন থেকেই চলছে রহস্য।

প্রখ্যাত নেতাজী গবেষিকা পূরবী রায় বলেছেন, "বিভিন্ন সময়ের ক্ষমতাসীন সরকার নেজাতীর অন্তর্ধান নিয়ে গত ছয় দশক ধরে প্রহেলিকা করে চলেছে। বিশেষত নেহরুর উত্তরাধিকারীরা এবং তাঁদের পোষ্যপুত্ররা নেতাজীর বিষয়ে কোনও তথ্য প্রকাশ করতে চান না। কারণ তাহলে তাঁদের স্থান হবে আস্তাকুড়ে।

২০০৩ সালে মুখার্জি কমিশনকে তাইওয়ান সরকার সরাসরি জানিয়েছে, বিমানবন্দরের রেকর্ড অনুযায়ী তাইহোকুতে ওই দিন কোনও বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি। ফলে সেখানে নেতাজীর মৃত্যুর প্রশ্নই নেই।

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সালে এটলিকে লেখা চিঠিতে নেতাজী সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু লিখেছেন— 'আপনাদের যুদ্ধাপরাধী'। এই ভাষাতেই বোঝা যায়, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষ বসু সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু কী মনোভাব পোষণ করতেন। এই শব্দ একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর কাছে অপমানজনক। হিন্দি পাঞ্চজন্য পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়— ১৯৬৭ সালে জাপান সরকার নেতাজী অন্তর্ধান নিয়ে যৌথ তদন্তের প্রস্তাব দিলেও তা খারিজ করে দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। নিবন্ধে বলা হয়েছে, নেতাজী আই এন এ সরকারের প্রধান ছিলেন। তিনি প্রচুর তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন। নেহরু কেন সিঙ্গাপুরে গিয়ে ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তার তদন্ত হওয়া দরকার। পাঞ্চজন্যের প্রশ্ন, নেহরু কি আই এন

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

- **BOSCH LTD.**
- **BOSCH, GMBH-GERMANY,**
- **DEUTZ, A. G., GERMANY**
- **LOMBARDINI - ITALY,**
- **V. M. MOTORI - ITALY**

SHYAM TEXTILES LTD.

156A, MAHATMA GANDHI ROAD

KOLKATA - 700 007

এ-র তহবিল আত্মসাতের উদ্দেশ্যেই সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন?

১৯৪৬ সালে ভারতীয় আইন সভার নির্বাচনে জনগণের সমর্থন পেতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তির চাবিতে বক্তৃতার তুফান তুলেছিলেন। নেহরু নিজে কালো গাউন পরে 'লালকেল্লা বিচার' পর্বের বিচার সভায় হাজির হয়েছিলেন। অথচ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্‌লি সে কথা বলতে পেরেছিলেন অর্থাৎ আজাদ হিন্দ সরকার, আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং যুদ্ধবন্দি আজাদ হিন্দ বাহিনীর 'লালকেল্লা বিচার'কে কেন্দ্র করে সারা দেশের ব্রিটিশ ভারতীয় ফৌজ, রাজকীয় নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া বিকল্প ছিল না। পণ্ডিত নেহরু তা বলতে পারেননি।

'ক্ষমতা হস্তান্তর' সম্পর্কিত দলিলের ৬নং ভল্যুমে সে কথা নির্দ্বিধায় বলা আছে— তার সার সত্য হলো, আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রামের ফলেই তারা ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে।

এই কথার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়— ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তীকে ব্রিটিশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি বলেছিলেন, একমাত্র নেতাজীর জন্য তাঁরা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এটলিকে তখন প্রশ্ন করা হয়— এক্ষেত্রে গান্ধীজীর ভূমিকাকে আপনি কী মনে করেন? এর উত্তরে এটলি অবজ্ঞার সুরে বলেছিলেন— M-I-N-I-M-A-L.

নেতাজীর রাজনৈতিক উচ্চতা অনেক বেশি ছিল। তার সঙ্গে ছিল নৈতিক উচ্চতাও। এ প্রসঙ্গে জানা যায়— নেতাজী যখন আজাদহিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সেই সময় তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রমে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা তাঁকে বলেন, আপনি রোজ একটা করে ডিম খাবেন। নেতাজীর উত্তর, যেদিন আমার আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সৈনিককে ডিম খাওয়াতে পারব, সেদিন খাব। পক্ষান্তরে রাজভবনে নেহরু কীরকম খাবার খেতেন তারও বিবরণ খবরের কাগজ থেকে জানা যায়। নেহরু খেতেন— 'মুরগির দুটো ডিম সিদ্ধ আর মাখন ও মধু মাখানো দুটি রুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারতেন। এরপরই ধোঁয়া ওঠা কফি চাই। গরম একটু কম হলেই ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। লাঞ্চ টাইমে তিনি প্রথমে খেতেন এক প্লেট স্যুপ। তারপর দু-চারখানা মাছের ফ্রাই। ভেটকি মাছের টুকরো লেবুর রস ও ডিমে ভিজিয়ে সামান্য নুন দিয়ে ভেজে দেওয়া হতো। এরপর চিকেন রয়্যাল। এই চিকেন রয়্যাল বানাতে তখনকার দিনে লাগত দুটি বড়ো মুরগি। একটি দিয়ে হতো কিমা। তারপর মাখন ও যাবতীয় মশালাপাতি দিয়ে ভাজা হতো। ভাজা ঠিক হয়েছে কিনা বুঝতে জলে ফেলে দেখা হতো, ভাসছে কিনা। ওই ভাজা কিমা মশলা সহযোগে আর একটি বড়ো মুরগির নাড়িভুঁড়ি বের করে ঢুকিয়ে সেলাই করে দেওয়া হতো। যখন আস্ত মুরগিটির লোমকুপ দিয়ে মাখন গড়িয়ে পড়ত, তখন সেটিকে নেহরুজীর প্লেটে পরিবেশন করা হতো। রাতেও ছিল নাকি একই মেনু। ডিনার শেষে রাতে যখন কাজ করতেন, তখন বিভিন্ন ধরনের ফলের রসে একটু একটু করে সিপ দিতেন।

অনেকেই মনে করতেন, নেতাজী ফিরে এলে নেহরুর গদি নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত। ২০১৩ সালের প্রথমের দিকে মস্কোর রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহারাজ স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ (রথীন মহারাজ) বলেছিলেন, নেতাজীকে শেষবারের মত দেখা গিয়েছিল সাইবেরিয়ার কারাগারে। রথীন মহারাজের এই মন্তব্যে খুবই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কখনই নিজের মত বদলাননি। তিনি আরও বলেছিলেন, মস্কোতে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও সাইবেরিয়ার ও মস্কো শহরের কারাগারে নেতাজীকে দেখতে গিয়েছিলেন। মুখোমুখি দেখা করার অনুমতি তিনি পাননি। তবে একটি ছোটো জানালা দিয়ে দূর থেকে তিনি সুভাষকে দেখেছিলেন। রথীনবাবু শুনেছেন, তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছিল নেতাজীকে। তিনি বলেন, ২১ বছর ধরে মস্কোয় থাকাকালীন তিনি এসব তথ্য জেনেছেন।

কংগ্রেস এবং তাদের দরবারি ইতিহাসবিদরা নেতাজীর অবদান অস্বীকার করলেও ইংরেজ ঐতিহাসিকরা নেতাজীকে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর সংগ্রামের ফলেই ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছে। মাইকেল এডোয়ার্ডস সেই কথাটাই একটি মাত্র বাক্যে তুলে ধরেছেন— 'The Ghost of Subhash Bose, like Hamlet's father walked the battlements of Redfort and his Suddenly amplied figure over awed the conferences that were to lead to Independence.' মাইকেল এডোয়ার্ডস পরিষ্কার করে বলেছেন, ভারতবাসী নেতাজীর কাছেই সবচেয়ে বেশি ঋণী।

নেতাজীর মতো নেতা ভারতবর্ষে তৈরি হয়নি। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। কিন্তু সেই নেতার অন্তর্ধান রহস্য আজও উন্মোচন হলো না। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালের আগে জাপানের মাটিতে অখণ্ড ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার গঠন হয়। আর তিনিই ছিলেন সেই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ইতিহাসের পাতায় তাঁকে এই স্বীকৃতি দিতে হবে। ▮

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার আট পাতা বৃদ্ধি এবং আংশিক রঙিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের কথা ভেবে আমরা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করিনি, পুরানো দামেই (১০ টাকা) এতদিন আমরা পরিবেশন করে এসেছি। কিন্তু ক্রমাগত ছাপার কাগজ ও অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে 'স্বস্তিকা'র প্রতি কপির দাম ১২ টাকা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

আশা করি, আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

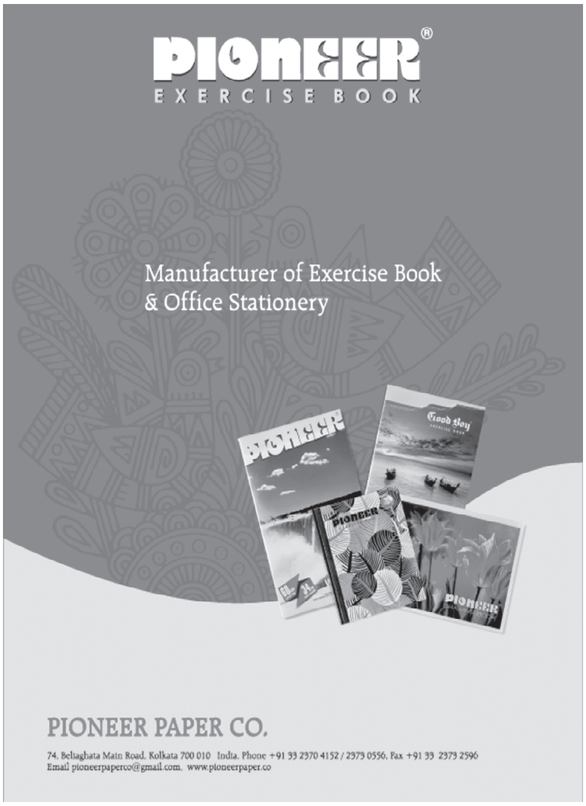

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

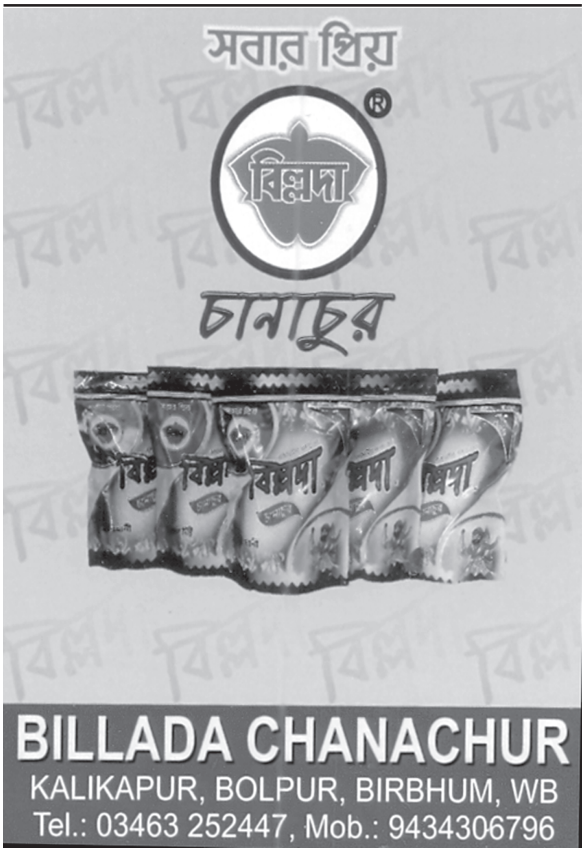

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নেতাজী সুভাষ

প্রণব দত্ত মজুমদার

দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য মহৎ আত্মোৎসর্গের জীবন ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদানই সর্বাধিক। ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও দেশভক্ত ছিলেন সুভাষ। ১৯১৯ সালে বিএ (দর্শনশাস্ত্র) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। তারপর বিলেত যান তিনি। সেখানে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে ট্রাইপস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের অধীনে উচ্চপদের সিভিল সারভিস পরিত্যাগ করে ১৯২১ সালে ফিরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে।

সেই সময় রাউলাট অ্যাক্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯ সাল থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারাদেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। সুভাষচন্দ্র সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং দেশবন্ধুর সঙ্গে ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর কারাবরণ করেন। এটা তাঁর প্রথম কারাবাস। এই আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠছিল তখন উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরার ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন, সত্যাগ্রহীরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে এই অজুহাতে।

১৯২৭ সালের শেষ দিকে সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র করে দেশ আবার উত্তাল হয়ে উঠে। ১৯২৮ সালের ৩০ অক্টোবর লাহোরে সাইমন কমিশন-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবার সময় পুলিশ অফিসার স্যান্ডার্স কর্তৃক বিক্ষোভকারীদের উপর নির্মম লাঠিচার্জ, ফলস্বরূপ লাজপত রায়ের মৃত্যু, এর বদলা হিসেবে বিপ্লবী ভগত সিংহ, শুকদেব এবং রাজগুরু কর্তৃক ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর স্যান্ডার্সকে হত্যা, চরমপন্থী বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে দেশের পরিস্থিতি যখন ক্রমশই গরম হয়ে উঠছে তখন আবার গান্ধীজী আসরে নামলেন তাঁর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মন্ত্র নিয়ে। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি অভিযানের মাধ্যমে গান্ধীজী ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলন সারাদেশ জুড়ে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ সরকারও নির্মম ভাবে দমন করে এই আন্দোলন। এই আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করছিল তখন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য বিলেতের গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ পেতেই গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে, ইংরেজের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এই বলে আলোচনা করার জন্য বিলেতে চলে গেলেন। কিন্তু ফিরে এলেন খালি হাতে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের আন্দোলনে মনপ্রাণ দিয়ে অংশগ্রহণ করে এবং গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ধারা দেখে সুভাষচন্দ্র হতাশ হন। আন্দোলন যখনই চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে তখনই কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে সেই আন্দোলন বন্ধ করে দেন গান্ধীজী। সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি

With Best Compliments From :-

ASHOK AGARWALA

PRAGATI IMPEX PVT. LTD.

5, Clive Row, 2nd Floor,
Room No. 41
Kolkata - 700 001

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works
GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North)
PIN-700 136

Office :
3, Synagogue Street,
Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761

করেন গান্ধীজীর পথে শক্তিশালী ধুরন্ধর ইংরেজকে কাবু করে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে কংগ্রেসকে গান্ধীজী প্রদর্শিত প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স-এর পথ পরিহার করে অ্যাকটিভ রেসিস্ট্যান্স-এর পথ ধরতে হবে। তিনি বলেন—"The latest Act of Mohatma Gandhi in suspending civil disobedience is a confession of failure. We are of opinion that Mohatma as a political leader has failed. The time has come for a radical re-organisation of the Congress on a new principle with a new method for which a new leader is essential, as it is unfair to expect the Mohatma to work on a programme not consisted with his lifelong principle."

সুভাষ গান্ধীবাদীদের মতো নরমপন্থী ছিলেন না। তিনি ছিলেন গরমপন্থী নেতা। গান্ধীজী যে চরমপন্থী বিপ্লবীদের বিপথগামী বলে নিন্দেমন্দ করতেন, সুভাষচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে কৌশলে যোগাযোগ রেখে তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল করতে চাইতেন। সুভাষ ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন এবং ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি কংগ্রেসকে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার জন্য এগোতে চাইলেন। অহিংসার পূজারি গান্ধীজী সুভাষের এইসব কার্যকলাপ পছন্দ করলেন না; তাই পরের বছর ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র আবারও সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে গান্ধীজী কূটকৌশলে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করেন। দমে না গিয়ে সুভাষচন্দ্র নিজের পার্টি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' তৈরি করে নতুন উদ্যমে তৈরি হতে থাকলেন।

এই সময়ে ১৯৩৯ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের পটভূমিকায় ইংরেজ সরকার অর্ডিনেন্স করে সবরকম আন্দোলন, মিটিং, মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সুভাষচন্দ্র ইংরেজ সরকারের এই ফরমানের বিরোধিতা করে ১৫০ বছর ধরে কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে থাকা দাসত্বের প্রতীক হলওয়েল মনুমেন্ট ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের ৩ জুলাই তাঁর অনুগামীদের নিয়ে হলওয়েল মনুমেন্টের দিকে মিছিল আরম্ভ করলেন। ইংরেজের পুলিশ সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকিয়ে দিল। এটা ছিল সুভাষচন্দ্রের ১১তম জেল যাত্রা। সুভাষ উপলব্ধি করলেন যুদ্ধের পটভূমিকায় ইংরেজের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে, তাঁকে জেলে বসে সময় নষ্ট করলে হবে না। তাই কৌশল হিসেবে তিনি হুমকি দিলেন তাঁকে মুক্তি না দিলে তিনি আমরণ অনশন করবেন। ইংরেজ সরকার কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে এলগিন রোডের বাড়িতে নজরবন্দি করে রাখল। সুভাষচন্দ্র অসামান্য দক্ষতায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি এলগিন রোডের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন।

তিনি মহম্মদ জিয়াউদ্দিন নাম নিয়ে এক পাঠান ইন্স্যুরেন্স এজেন্টের ছদ্মবেশে ভাইপো শিশির বসুর গাড়িতে করে পালিয়ে গোমো চলে যান। গোমো রেলস্টেশন থেকে ফ্রন্টিয়ার মেল ধরে চলে যান পেশওয়ার। সেখান থেকে ছদ্মবেশে কাবুল হয়ে মস্কো। মস্কো থেকে জার্মানির বার্লিনে চলে যান ১৯৪১ সালের ৩ এপ্রিল। ২ মাস ১১ দিনের ভয়াবহ রোমহর্ষক বিপদসঙ্কুল ছিল সেই যাত্রা। জার্মানি পৌঁছে তাদের বিদেশ দপ্তরের সহায়তায় গঠন করেন--- 'Working Group India', Special Department for India', Azad Hind Radio' ইত্যাদি। আজাদ হিন্দ রেডিয়ো থেকে ১৯৪১ সালের নভেম্বরে ভেসে আসে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর— আমি সুভাষ বলছি। আজাদ হিন্দ রোডিয়োর মাধ্যমে ভারতবাসীর উদ্দেশে নানারকম অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করা হতো। তিনি ইতালির মুসলিনি এবং জার্মানির হিটলারের সঙ্গে দেখা করে ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময় অক্ষ শক্তির শরিক জাপান ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর অ্যালাউড ফোর্সের ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপান দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশকে পর্যদুস্ত করতে থাকে।

এদিকে জাপানে আত্মগোপন করে থাকা আর এক বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসু পশ্চিম এশিয়াতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। জাপানিদের হাতে ব্রিটিশ বাহিনীর বন্দি সেনানিদের নিয়ে রাসবিহারী বসু তৈরি করেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে পূর্বএশিয়ার রণাঙ্গনে এসে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। সুভাষচন্দ্র ঠিক করলেন জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে পূর্বএশিয়ার রণাঙ্গণে ব্রিটিশশক্তিকে আক্রমণ করবেন। সেই পরিকল্পনা করে সহযোগী আবিদ হাসানকে নিয়ে তিনি ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কিয়েল বন্দর থেকে জার্মান নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজে রওনা হন। দীর্ঘ দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল সাবমেরিন যাত্রা করে তিনি পূর্বএশিয়ার জাপানে এসে উঠলেন। সেখান থেকে গেলেন টোকিয়ো। ১৯৪৩ সালের জুনের প্রথম দিকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে মিটিং করেন। ১৯৪৩ সালের ২৭ জুন রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে পৌঁছন সুভাষচন্দ্র। রাসবিহারী বসু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্রকে বরণ করে নেন। তাঁকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদেও বরণ করা হয়। সেখানে সবাই তাকে 'নেতাজী' বলে সম্বোধন করতে থাকেন।

আজাদ হিন্দ বাহিনীতে ৫০,০০০ সৈনিক এবং ১.৫০০ অফিসার যোগদান করেছিলেন। তাদের উদ্দেশে আবেগপূর্ণ দেশাত্মবোধক ভাষণ দেন তিনি। সেখানেই তিনি রণনাদ তুলেছিলেন 'দিল্লি চল', 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ'। যেসব সৈনিক এতদিন ব্রিটিশের হয়ে লড়াই করেছেন তাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার

জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। বহু তেজদীপ্ত মহিলা প্রাণদানের জন্য এগিয়ে এলেন। নেতাজী সুভাষ তাঁদের নিয়ে গড়লেন রানি ঝাঁসি বাহিনী। নেতাজী জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কোহিমা, ইম্ফল ইত্যাদি এলাকা দখল করে নেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ২৬০০০ সৈনিক প্রাণদান করেন এই যুদ্ধে। অধিকৃত ভারতীয় ভূমিতে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর নেতাজী সুভাষ গঠন করেন অখণ্ড স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার 'আজাদ হিন্দ সরকার'। উত্তোলন করেন তিরঙ্গা পতাকা। ছাপা হয় স্বাধীন সরকারের মুদ্রা। জাপান, জার্মানি, ইটালি-সহ বিশ্বের ১১টি দেশ স্বীকৃতি দান করে সেই সরকারকে। জাপানিরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়। নেতাজী ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর সেখানে স্বাধীন সরকারের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দ্বীপ দুটির নামকরণ করেন 'শহিদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ। ইতিহাসের নিরিখে নেতাজী সুভাষই হলেন স্বাধীন অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

যাইহোক, ১৯৪৪ সালের মে মাস থেকে জাপান যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকে। অবশেষে মিত্রশক্তি শরিক আমেরিকা সারা বিশ্বকে হতচকিত করে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলে। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে। ঠিক হয় নেতাজী আত্মগোপন করবেন। এরপর নেতাজীর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট জাপানের টোকিয়ো যাওয়ার পথে তাইওয়ানের তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যু নিয়ে শেষ যে তদন্ত কমিশন হয়েছিল, সেই বিচারপতি মনোজ মুখার্জি কমিশনের (১৯৯৯-২০০৫) মতে ১৮ আগস্টে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের বন্দি করে দিল্লির লাল কেল্লায় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাঁদের বিচার আরম্ভ হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষ ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্ব ও আত্মবলিদানের কাহিনি সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের বিচারের প্রহসনে দেশের মানুষ বিক্ষেভে ফেটে পড়েন। ব্রিটিশ বাহিনীতে যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সেনা ছিল তাঁরা যখন দেখল তাঁদের বন্ধু ও ভাইয়েরা দেশের স্বাধীনতার জন্য দুঃসাহসিক লড়াই করেছেন, অকাতরে প্রাণ বলিদান করেছেন; আবার তাঁদেরই বিচার করে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করছে ইংরেজ, তখন তাঁরা দেশপ্রেমের আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। সারা ভারত জুড়ে সেনাবিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল। মুম্বাইয়ে প্রথমে নৌবাহিনী বিদ্রোহ করল, ক্রমে তা পদাতিক এবং বিমান বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ল। বলা চলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারকে কেন্দ্র করে সারাদেশ জুড়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল। ইংরেজ নারী শিশুরা নিরাপত্তার অভাবে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত ব্রিটিশ সেনানীরা নতুন করে সংঘাতে যেতে আগ্রহী নয়। ইংরেজ সরকার খুব চাপে পড়ে গেল।

প্রশ্ন জাগে, ১৯৪২ সালের আগস্টে গান্ধীজীর ডাকা ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে ইংরেজরা দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই নির্মম ভাবে দমন করে ফেললেও বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজ কেন হঠাৎ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছিল? তা কি গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ভয়ে? আসল কারণটা হলো--- নেতাজী সুভাষ আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের মধ্যে দেশপ্রেমের যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন, তাঁদের বিচারের প্রহসনে দেশপ্রেমের সেই আগুন ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও দাবানলের মতো বিদ্রোহের আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই বিদ্রোহের কথা নেতাজীর মৃত্যু রহস্যের মতোই চেপে রাখা হয়েছে। ইংরেজ দেখল— ভারতীয় সৈনিক, ভারতীয় পুলিশ যাদের সাহায্যে ভারতীয়দের এতদিন দমন করা হতো, নেতাজীর মন্ত্রে তাঁরা এখন জেগে উঠে বিদ্রোহ করছে। আধুনিক অস্ত্র নিয়ে দুটি বড়ো বড়ো বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করার অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে এবং তারা সংখ্যায় ভারতে থাকা ইংরেজ সৈনিকদের থেকে অনেক বেশি। বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অন্য জায়গা থেকে গোরা সৈন্য এনে বিরাট ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখা আর ইংরেজের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা উপলব্ধি করল মানসম্মান নিয়ে ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষে থাকা আর সম্ভব নয়, ভারতবর্ষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাই মানসম্মান বজায় রেখে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ইংরেজ তড়িঘড়ি ভারত ছেড়ে চলে যায়। এটাই ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্যটা তখনকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি স্বীকার করেছেন। এই সত্যকে কংগ্রেস ও তাদের তাঁবেদাররা এতদিন ধরে চেপে রেখেছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঐতিহাসিক সত্যকে মর্যাদা দিয়ে আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর দিল্লির লালকেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করে নেন। আবার ৩০ ডিসেম্বর তিনি আন্দামানে গিয়ে নেতাজী কর্তৃক স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলনের ৭৫ বছর পূর্তি পালন করেন। সেখানকার রস আইল্যান্ডের নামকরণ করেন 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস দ্বীপ'। সেখানকার 'নীল আইল্যান্ড' ও 'হ্যাভলক আইল্যান্ড'-এর নাম নেতাজীর রাখা 'শহিদ দ্বীপ' ও 'স্বারাজ দ্বীপ' পুনরায় ঘোষণা করে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই কাজে কোটি কোটি ভারতবাসীর আহত আবেগ কিছুটা শান্ত হয়েছে।

দেশবাসীর আশা, প্রধানমন্ত্রী যেন ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবরকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নেতাজীর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নেতাজী সংক্রান্ত সমস্ত ফাইল উন্মোচনের ব্যবস্থা করেন। ■

নেতাজীর মৃত্যু প্রচারে চক্রান্তকারীদের নির্লজ্জ প্রয়াস

বেদ মোহন ঘোষ

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র মৃত এই সম্পূর্ণ মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি এখনও প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কলকাতার একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকায় 'এবার ফিরিয়ে আনা হোক চিতাভস্ম' এই শিরোনামে একটি অতি আজগুলি প্রতিবেদনে নেতাজীর ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর এক অবাস্তব জঘন্য ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক অতি সুন্দর নাট্যরূপের বর্ণনায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। যার মূল বিষয়বস্তু জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম তথাকথিত নেতাজীর এবং সেটা ভারতে আনা হোক। অত্যন্ত পরিতাপের এবং আশ্চর্যর বিষয় যে, সম্প্রতি এক প্রশ্নের উত্তরে সরকারি আর টি আই আধিকারিক নাকি জানিয়েছেন যে ওই চিতাভস্ম নেতাজীর দেহাবশেষ এবং হয়তো তারই নিরিখে ওই অসাধারণ নাটকীয় মিথ্যা প্রতিবেদনের সৃষ্টি।

১৯৭৮ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর রিপোর্ট বিশ্বাস করেননি। তিনি খোলাখুলি ও সুস্পষ্ট ভাষায় ২৮ আগস্ট ১৯৭৮ সালে জানিয়েছিলেন--- 'বিভিন্ন নথিপত্র এবং সাক্ষীদের বয়ানে সন্দেহাতীত ভাবে তাঁর মৃত্যু প্রমাণিত হয়নি এবং সেই কারণে ওই সিদ্ধান্ত সরকারি ভাবে গ্রহণ করা যায় না।'

বিষয়টি কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রী দেশাইয়ের পর তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার 'নরসীমা রাও-প্রণব মুখার্জীর' সময় নেতাজীর জন্মশতবর্ষে সুভাষচন্দ্রকে 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করার সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছিল। এ এক অতি সুন্দর কূটনৈতিক কৌশল। একই সঙ্গে নেতাজীর মৃত্যু প্রমাণ করা আর অপরদিকে

ইনিই কি নেতাজী? তাসখন্দ, ১৯৬৬।

জনসাধারণের সম্মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাজী সম্বন্ধে এক উচ্চ ভাবমূর্তি তুলে ধরা। কিন্তু কী হলো শেষ পর্যন্ত? কিছু নেতাজী অনুগামী কলকাতা হাইকোর্টের Writ Petition case No. 834 of 1995 জানতে চাইলেন নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে সরকারের কাছে কী তথ্য আছে এবং ভারতরত্নের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য কী? কেন্দ্রীয় সরকার পড়ল বিপাকে। তারা তাদের সুবিধার্থে কেসটি সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরিত করল। সরকার আশা করেছিল কলকাতার আবেদনকারীরা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল এবং বার বার সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা দিতে না পারায় পিছিয়ে যাবে। কিন্তু প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ফলি এস নরিম্যান ও শ্রীকৃষ্ণ মণি বিনা পারিশ্রমিককে আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করতে থাকেন। প্রমাণ অভাবে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘোষণার সরকারি চক্রান্ত ব্যর্থ হলো। রাষ্ট্রপতি ভবনের 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' আদেশনামা বাতিল হলো।

এরপর একটি জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট এনডিএ সরকারকে নেতাজীর তথাকথিত অন্তর্ধান সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিটি গঠনের আদেশ দেন। সেই নির্দেশ মতো সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীমনোজ কুমার মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন হয় ১৯৯৯ সালে। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কমিশন ছয় বছর নিরলস গবেষণা চালিয়েছিল। সদস্যরা সফর করেছিলেন জাপান-রাশিয়া- ইংল্যান্ড প্রভৃতি স্থানে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা ১৩১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ৩০০টি গুরুত্বপূর্ণ নথি দাখিল করেন। কমিশনে নেতাজী গবেষক অনুজ ধর এক অকাট্য দলিল পেশ করেন। তাতে দেখা যায় জাপান সরকার লিখিত ভাবে জানাচ্ছে ওইদিন তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং এই তথ্য তাইওয়ান সরকার ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিল ১৯৫৪ সালে। (কমিশনের পরে প্রাপ্ত অপর একটি প্রামাণ্য দলিল ২৫.১১.১১ তারিখের লোকসভার ডাইরেক্টর শ্রীমতী কল্পনা শর্মার পত্র। তিনি নেতাজী গবেষক রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্যের ২০.১০.১১ তারিখের পত্রের উত্তরে লিখছেন— 'কোনও বিমান দুর্ঘটনাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়নি। ভারত সরকারের কাছে নেতাজীর মৃত্যুর কোনও প্রমাণ নেই।') বিচারপতি মনোজ মুখার্জী এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তারিত রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পেশ করলেন ২০০৫ সালের ৮ নভেম্বর। তিনি জানালেন ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সালে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি এবং ওই চিতাভস্ম নেতাজীর নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারত সরকার ২০০৬ সালের ১৮ মে পার্লামেন্টে ওই রিপোর্ট অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে বাতিল করে দিল।

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর প্রামাণ্য সংবাদ ও তথ্যর বিবরণ প্রচারিত হয়েছে মূলত নেতাজীর সঙ্গে একই বিমানের সহযাত্রী কর্নেল হবিবুর রহমানের বিবৃতি উদ্ধৃতি করে। এই কর্নেল রহমান ছিলেন নেতাজীর একান্ত বিশ্বস্ত সেনানী। বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুসংবাদ প্রচারের মাধ্যমে নেতাজীর অন্তর্ধানের পরিকল্পনার অন্যতম রূপকার ছিলেন তিনি। নেতাজীর শেষ আদেশ ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ অনুসারে ব্রিটিশ-মার্কিন গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে তিনি এই দুর্ঘটনার গল্পের অভিনয় করে গেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। নেহরু পদ ও অর্থ দিয়ে নেতাজীর এই বিশ্বস্ত মানুষটিকে কিনতে পারেননি। ভারত ছাড়তে তাঁকে প্রায় বাধ্য করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নেন। সেখানে তিনি ১৯৫৩ সালে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই মিথ্যা বিমান দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ করে গেছেন। ■

Rang Rez Sarees

*Wholesalers of Fancy Printed
& Embroidered Sarees*

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Entrance also from 77/1/A, Park Street)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 2265-0772 (Shop),

for Designer Super Net Sarees

JALAN JAN KALYAN TRUST

Flat No. 1A, Paramount Apartments

25, Ballygunge Circular Road

Kolkata - 700 019, TEL : 2475-6524, 2475-7760

Fax : 2475-7619, E. mail : madhuban@salyam.net.in

।। চিত্রকথা ।। পরীক্ষিৎ ।। ৬ ।।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

email : ashokatools@hotmail.com

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331229004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor

Kolkata-700016

Phone : 22297263

বিশেষ প্রতিবেদন

মুখ্যমন্ত্রীর পোষা মিডিয়ার ছলনায় অপমানিত দিলীপ

সন্দীপ চক্রবর্তী

রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ কাজটা মোটেই ঠিক করেননি। তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল এটা পশ্চিমবঙ্গ। এবং এখানকার সাংবাদিকেরা অনেক আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দলদাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, দিলীপবাবুর রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ এবং সেইসঙ্গে ‘পুনশ্চ’ হিসেবে জুড়ে দেওয়া ভদ্রলোকের রসিকতা নিয়ে যে জলঘোলা করা হতে পারে সেটা ওঁর মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের ভুলে যাওয়া ঠিক হয়নি। এখন নিশ্চয়ই তিনি বুঝেছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতে খেয়ালও রাখবেন। সব থেকে ভালো হয় যদি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনটি নিজে রেকর্ড করে রাখেন। তাহলে তিল থেকে তাল বানাবার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

কিন্তু ঠিক কী বলেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, যা নিয়ে খবরের কাগজে, নিউজ চ্যানেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছিছিক্কার পড়ে গেল। জন্মদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এবং এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কারোর প্রধানমন্ত্রী হবার কথা ভাবা হয়, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই বলতে হবে। বাংলা ভাষার বাক্যে ‘যদি’ ‘তা হলে’ ইত্যাদি শব্দবন্ধ থাকলে তা কোনও সম্ভাবনাকে সূচিত করে। অর্থাৎ এটি কোনও স্থির সিদ্ধান্ত নয়। এর মধ্যে বক্তা বা লেখকের সংশয় ও সন্দেহ দুইই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। উপরন্তু, দিলীপবাবু কিঞ্চিৎ রসিকতাও ঢেলে দিয়েছিলেন। সেটা তার বলার ভঙ্গি দেখে বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু মিডিয়া তার কথাটি নিয়েছে, কথার ভাবটি বর্জন করেছে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ তাতেই বিতর্ক তৈরি হবে এবং উনিশের নির্বাচনের মুখে বিজেপিকে চূড়ান্ত হেনস্থা করা যাবে। যার সুফল ভোগ করবে তৃণমূল।

মিডিয়ার নিরপেক্ষতা অনেককাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। বেড়ে গেছে দেশে কৃত্রিম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি করে ধান্দাবাজির ক্ষেত্র। মিডিয়া এখন মোটা উৎকোচের বিনিময়ে খবর ‘তৈরি’ করে। সুতরাং দিলীপবাবুদের বার বার অপমানিত হতেই হবে।

অথচ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে মনে হতে পারে দিলীপবাবু যা বলেছেন সেটা কি পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষেরই ভাবনা নয়? এদের সকলকে তৃণমূলের দলদাস ভাবার কোনও কারণ নেই। এরা হয়তো তৃণমূলের কর্মীও নন, স্রেফ ভোটার। কিংবা কংগ্রেস, সিপিএম বা বিজেপির সমর্থক। কিন্তু প্রাদেশিক সত্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরা মাঝে মাঝে ভাবেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কারোও কথা ভাবা হয় তাহলে মমতাই সেরা চয়েস। যাঁরা এমনটা মাঝে মাঝে ভাবেন দোষ তাঁদের নয়। কারণ মিডিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে বারংবার তুলে ধরে। জাতীয় স্তরে মমতার গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে কাল্পনিক ছবি ফুটিয়ে তোলে। এদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতির হাল-হকিকত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনে জিতলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরাও অবসর মুহূর্তে কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ভালোবাসেন। এটাই হিন্দু বাঙ্গালির চরিত্র। হিন্দু বাঙ্গালি একই সঙ্গে আবেগ এবং কল্পনাপ্রবণ। সেই কারণে হিন্দু বাঙ্গালির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনেকাংশেই আবেগ এবং কল্পনানির্ভর। দিলীপবাবু পরোক্ষে পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক বাস্তবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু গ্রহণ যে করেননি সেটা তার ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার।

কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন দিলীপবাবু? সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে কিছু বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থ জীবন কামনা করেন। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিন দিন প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হয়ে উঠেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর কী মত? দিলীপবাবু তখন সহজ ভাবে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন। তবে তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই কেউ প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই সবার আগে মনে

With Best

Compliments
From

Punjab Glass Depot

OMEX (INDIA) SALES PVT. LTD.

Earth Moving, Mining, Auto &
General Machinery Spares

6, Mangoe Lane, 2nd Floor,
Kolkata - 700 001

Phone : 2210-3267, 2248-0761

Fax : 22102969,

E-mail : omexindi@cal2.vsnl.net.in

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial Private Limited

M. E. M. INDUSTRIES

AN ISO 9001 : 2008 Company

e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Telefax : 033-22351868

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

Also Sole Distributor
BELDEN (USA)Cables.

আসে। প্রশ্ন হলো, এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? অসংগতিই বা কেন খোঁজ হচ্ছে? বিজেপি সর্বভারতীয় দল। সুতরাং দলের রাজ্যস্তরের নেতাদের প্রধানমন্ত্রী হবার এখনই কোনও সম্ভাবনা নেই। কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে বটে কিন্তু একই অর্থে খাটে না। কারণ কংগ্রেস পরিবারতান্ত্রিক দল। যদি ধরে নেওয়া হয় অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের বর্তমান প্রদেশ সভাপতির সর্বভারতীয় নেতা হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তাহলেও তিনি কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী হবেন গান্ধী পরিবারের কেউ। নয়তো ওই পরিবারের বশংবদ কোনও হতভাগ্য। বাকি রইল সিপিএম। ২০১৯ সালে দাঁড়িয়ে অতি বড়ো বাম সমর্থকও বোধহয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু বা সীতারাম ইয়েচুরিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কল্পনা করতে পারবেন না। এদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা বা গ্রহণযোগ্যতা কিছুই নেই। এদের সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গেই কিছু করা সম্ভব নয়, সারা দেশের কথা না ভাবাই ভালো।

এসব কথা মিডিয়া জানে না তা নয়। তারা ভালোই জানে দিলীপবাবু যা বলেছেন তা নিছকই কথার কথা। ঠাট্টাও বলা যেতে পারে। জন্মদিনের শুভেচ্ছায় তিনি রাজনৈতিক মতপার্থক্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাননি। বরং অসম্ভব জেনেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানন্ত্রী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। সবই সেদিন মমতার জন্মদিন ছিল বলে। আমরা, ভারতীয়রা জন্মদিনে কাউকে দুঃখ দিই না, দিতে চাই না। এই মমত্ববোধ আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু মিডিয়া এই শিষ্টাচারকে গুরুত্ব না দিয়ে বিকৃত করেছে। দিলীপবাবুর বক্তব্য এমনভাবে দাঁড় করানো হয়েছে মনে হয় যেন মমতা ও তাঁর মধ্যে গোপন কোনও বোঝাপড়া আছে। তলে তলে দিলীপবাবু এবং তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা এমন কিছু করছেন যা দলের নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যের বিরোধী। এবং যা পরোক্ষে সাহায্য করছে তৃণমূলকে। লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে যদি এরকম একটা ইঙ্গিত দেওয়া যায় যে দিলীপবাবুরা বা বিজেপি দলটাই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারা তৃণমূলের 'বি' টিম, ঠিক যেভাবে বাম আমলে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাকে 'তরমুজ' বলা হতো— অর্থাৎ তারা বাইরে সবুজ ভেতরে লাল— সেই ভাবে যদি বিজেপিকেও এই বলে দেগে দেওয়া যায় যে তারা বাইরে গৈরিক ভেতরে সবুজ, তাহলে তৃণমূলের লাভ হয় আর বিজেপির সর্বনাশ হয়। এটাই চেয়েছিল মিডিয়া। সম্মুখ যুদ্ধে পেরে না উঠলে গুপ্তঘাতকের সাহায্য নেওয়াই দস্তুর। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের অধিকাংশ মিডিয়া ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরের বেতনভুক গুপ্তঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রকৃত খবর চেপে দিয়ে এবং মিথ্যে খবর রটিয়েও যখন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত ঠেকিয়ে রাখা গেল না তখন মিডিয়ার নতুন কৌশল এই ব্যক্তিগত আক্রমণ। যে কাজ এতদিন রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা একে অপরের নামে করতেন, বিজেপির বিরুদ্ধে এখন সেটাই মিডিয়ার নতুন রণনীতি। নেতার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে যদি কালিমালিপ্ত করা যায় তাহলে তার দল সম্বন্ধেও মানুষ আস্থা হারাবে। যার ফল ফলবে নির্বাচনে।

আশার কথা এত কিছুর পরেও দিলীপবাবু তাঁর স্বাভাবিক ভদ্রতাবোধ হারাননি। অপমানিত হবার পরেও বিশ্বাস রেখেছেন তাঁর নিজস্ব এবং সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় মূল্যবোধের ওপর। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্মরণ করেছেন গত বছরের একটি বিশেষ দিনের কথা। দিনটা ২৪ জানুয়ারি। তখন তিনি মেরুদণ্ডের সমস্যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি। তিনি কেমন আছেন জানার জন্য ফোন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলীপবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে সেদিন মমতা জরুরি কিছু পরামর্শ দেন। বার বার অপারেশন করাতে নিষেধ করেন। এই ধরনের শিষ্টাচার মমতার মতো দাম্ভিক, অহংকারী এবং রাজনৈতিক ফয়দা-সর্বস্ব মহিলার কাছে প্রত্যাশিত নয়। তবুও তিনি শিষ্টাচার দেখিয়েছিলেন। ঘটনাটা দিলীপবাবুও ভোলেননি। তিনিও মমতার জন্মদিনে তাঁর প্রতি কোনও অশিষ্ট আচরণ করেননি।

সেই সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির পারফরম্যান্স কীরকম হবে তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। নির্বাচনে জিতে নরেন্দ্র মোদীই যে আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন সে ব্যাপারে কোনও ধোঁয়াশা রাখেননি দিলীপবাবু। জানিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের জন্যই তিনি আবার জিতে আসবেন। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি ভালো ফল করবে। কারণ সাধারণ মানুষ বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন। রাহুল গান্ধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা, যারা দিনরাত প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেন তাদের নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়েননি দিলীপবাবু। বলেছেন, এদের মানসিকতার সঠিক বর্ণনা পাওয়া যাবে কিশোরকুমারের একটি গানে, 'পলভর কে লিয়ে কোই মুঝে পেয়ার কর লে, ঝুটা হি সহি।' অর্থাৎ এরা অসম্ভবের স্বপ্ন দেখতে চান। মানুষকেও দেখাতেও চান সেই স্বপ্ন। এই কাজ রাজনৈতিক ভাবে করতে পারছেন না বলে মিডিয়াকে ব্যবহার করছেন। কিন্তু অসম্ভবের স্বপ্ন সিনেমায় পূরণ হয়, বাস্তবে হয় না। মিডিয়াও আমড়াগাছে আম ফলিয়ে দিতে পারে না।

মিডিয়ার নিরপেক্ষতা অনেককাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। বেড়ে গেছে দেশে কৃত্রিম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি করে ধান্দাবাজির ক্ষেত্র। মিডিয়া এখন মোটা উৎকোচের বিনিময়ে খবর 'তৈরি' করে। এই বিপুল পরিমাণ টাকার একটা বিরাট অংশ বিদেশ থেকে আসে। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় ফিরুন, এটা ওই বিদেশি প্রভুরা চায় না। সুতরাং দিলীপবাবুদের বার বার অপমানিত হতে হবে। অন্তত নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত। তারপর? বিজেপি ক্ষমতায় এলে মিডিয়ার জার্সি বদলাতে বেশি সময় লাগবে না। ▮

SANHIT GROUP OF COMPANIES

Sriniketan Road, Bolpur, Birbhum, West Bengal - 731204
Phone : +91+3463-255-560 / 257-769, E-mail : sanhitpolymer@yahoo.co.in
Fax :+91-3463-254215

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

Jumbo Bag Liner
Black Wraping Film
Temporry Shed (by Film)
Pallet Cover
Shrink Wrapping Film for Black Goods

Civil & Construction:

Construction Film for concrete
Separation membrane for Road Construction
Liner for Hazards West Pond
Liner for Water Reservoir
Disposal Glass & Cup

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204
Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433
E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215

SURYA FOUNDATION

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063, Tel. : 011-25251588, 25253681
Email : suryainterview@gmail.com Website : www.suryafoundation.net.in

Surya Foundation is a renowned organisation for imparting training to the youth for their all-round development. We require the following categories of dedicated & diligent youth (boys & girls) brought up in a sound **SANGH / SAMITI** culture with impeccable character and devotion to social work for entry in **SURYA FOUNDATION**. Candidates will be put through an interview process prior to their selection.
Posting will be given after successful completion of 3 months initial training at Surya Training Campus followed by one year On Job Training (OJT).

Post	Experience	Initial Training + OJT	After Training CTC
CA	IPCC / Inter	3 - 3.5 L Per Annum	As per Performance
	Fresher	5 - 6 L Per Annum	- do -
	Experienced (upto 5 years)	7.5 - 9 L Per Annum	- do -
	Experienced (above 5 years)	9 - 12 L Per Annum	- do -
Engineers, Fresher & Experienced	B.Tech (IIT)	7.5 - 9 L Per Annum	- do -
	B.Tech (NIT)	4.5 - 5 L Per Annum	- do -
	B.Tech (Other Institutes)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	M.Tech (IIT)	8.5 - 10 L Per Annum	- do -
	M.Tech (NIT)	5.5 - 7 L Per Annum	- do -
	M.Tech (Other Institutes)	3 - 3.6 L Per Annum	- do -
MBA	MBA (IIT + IIM)	15 L + Per Annum	- do -
	MBA (IIM)	12 - 15 L Per Annum	- do -
	MBA (Other Institutes)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
Post Graduate & Graduate	MCA, B.Ed., M.Ed., MSW, M.Sc., M.Com., M.A. *(Freshers / Experience) Ph.D. **	2 - 3 L Per Annum	- do -
	Mass Communication (Media)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store	2.4 L Per Annum	- do -
	B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com (Persuing / Passed)	1.2 L Per Annum	- do -
	Diploma	1.8 L Per Annum	- do -

- More deserving candidates of above categories may get higher salary.
* Ph.D. salary will be decided during the interview.

Application Form

(Apply on a separate sheet of paper)

Affix latest Photograph here

Post Applied For ________________
Full Name (In Capital) __________ Date of Birth _____ Caste _____________ Married / Single ___
Father's Name ___________________ Father's Occupation _____________ Monthly Income _____
Brothers (Excluding Self) _________________________ Sisters ___________
Educational Qualification_______________________________ (Attach Photocopy of Marksheet)
Have you attended NCC/NSS/OTC/ITC/Sheet Shivir? Give Details of location of Camp and dates __________________
Were you associated with Seva Bharati / Vidya Bharati / Vanvasi Kalyan Ashram / Any other Sangh Project? Give details
____
Is anyone known to you in Surya Group? Give his name and department ______________________________________
Have you ever been interviewed in Surya Foundation earlier? If yes, give Year & Cadre for which interviewed. __________
Give details of any special achievements, qualifications etc.
Address for Correspondence _________ Pincode ______ Phone No. ____ Mobile __________ Email ______________
Apply with detailed CV along with the application at the following address or Email : suryainterview@gmail.com.

Surya Foundation : B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063

Apply within two months of the publication of the advertisement

বুড়ির ষাঁড়

বহুযুগ আগে কোশল রাজ্যে এক গরিব বুড়ি ছিল। বুড়ির স্বামী, পুত্র কেউ ছিল না। শুধু কালো কুচকুচে একটি ষাঁড় ছিল। ষাঁড়টিকে বুড়ি নিজের সন্তানের মতো মনে করত। আসলে সেই জন্মে বোধিসত্ত্বই এই ষাঁড়রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বুড়ি খুব গরিব হলেও ষাঁড়টি খেতে না পেয়ে কষ্ট যেন না পায় তা নজর রাখত। বুড়ির খাবার না জুটলেও তার আদরের ষাঁড়টির জন্য শাকটা মুলোটা জোগার করে এনে খাওয়াত।

অবোলা প্রাণী হলেও ষাঁড়টি বুড়ির আদর ভালোবাসা বুঝতে পারত। মা ও ছেলের মতোই বুড়ি ও ষাঁড়ের সুখে-দুঃখে দিন কাটছিল। একববার এক গৃহস্থ তীর্থে যাবার সময় বুড়িকে তাদের গোরুগুলি দেখাশানা করার জন্য দিয়ে গিয়েছিল। একবছর পর ফিরে এসে বুড়িকে খুশি হয়ে একটি কালো বাছুর দিয়েছিল। সেই থেকে ওটি বুড়ির বড়ো আদরের ধন। বাছুরটি পেয়ে বুড়িও খুব খুশি হয়েছিল। বুড়ির সঙ্গে কথা বলার কেউ ছিল না। বাছুরের সঙ্গে বুড়ি কথা বলে স্বস্তি পেত। আদর যত্নে বুড়ি ওকে বড়ো করে। ষাঁড়টিও বুড়িকে নিজের মা-ই মনে করে।

ষাঁড়টি হৃষ্টপুষ্ট ও শিংঅলা হলেও খুবই শান্তশিষ্ট। তাই পাড়ার ছেলেরা ওকে দেখতে পেলেই দুষ্টুমি শুরু করে দিত। শিং ধরে , কান মুচড়ে নানাভাবে কষ্ট দিত। ষাঁড় নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করত। কোনও প্রতিবাদ করত না। আশেপাশের লোকে ষাঁড়টির শান্ত ব্যবহারে অবাক হয়ে যেত। কিন্তু লোকেরা তো জানতো না যে ষাঁড়টি আসলে বোধিসত্ত্ব। তার জীবনের মন্ত্র সত্য, ক্ষমা, অহিংসা। অহিংসার পূজারি ষাঁড়টি তাই কাউকে আঘাত করত না।

ষাঁড়টিও মনে করত তার বুড়িমা এত গরিব। নিজে না খেয়ে তাকে খেতে দেয়। বুড়িমার সন্তান হিসেবে তারও কিছু করা দরকার। তাই কাজের সন্ধানে ঘুরতে থাকে। নদীর ধারে চরতে চরতে একদিন দেখে এক বণিক পাঁচশো গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে বাণিজ্য করতে। কিন্তু তার গোরুগুলি নদীতে নামতে ভয় পাচ্ছিল। তাই বণিক গাড়িগুলি পার করার জন্য বলদের খোঁজ করছিল। তখনই নদীর ধারে একপাল গোরুর মধ্যে বলবান ষাঁড়টিকে দেখতে পেল বণিক। তারপর রাখালদের ডেকে জিজ্ঞেস করে ষাঁড়টি কার? আমি গাড়ি পার করার জন্য ষাঁড়টি ভাড়া নিতে চাই। রাখালরা বলল, ভাড়া দিতে হবে না, আপনি নিয়ে যান।

খুব খুশি হয়ে বণিক তার লোকদের ষাঁড়টিকে নিয়ে আসতে বলল। কিন্তু ষাঁড়টি এক পাও নড়ল না। বণিক তখন বলল আমার পাঁচশো গাড়ি পার করে দিলে দুই মুদ্রা হিসেবে হাজার মুদ্রা দেব। ভাড়া শুনে ষাঁড়টি এগিয়ে গিয়ে এক এক করে পাঁচশোটি গাড়িই পার করে দিল। বণিক হাজার না দিয়ে পাঁচশো মুদ্রা কাপড়ে বেঁধে ষাঁড়টির গলায় ঝুলিয়ে দিল। বণিকের ছোটো মনের পরিচয় পেয়ে ষাঁড়টি রেগে গিয়ে গাড়িগুলির সামনে এমন ভাবে দাঁড়াল যাতে গাড়িগুলি এগুতে না পারে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে হঠানো গেল না। বণিক বুঝতে পারলো এই ষাঁটিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। তাই হাজার মুদ্রাই ষাঁড়টির গলায় বেঁধে দিল। বোধিসত্ত্ব রূপী ষাঁড়টিও তখন বাড়ির রাস্তা ধরল।

ষাঁড়ের গলায় হাজার মুদ্রা দেখে লোভে রাখালরা এগিয়ে এল। কিন্তু ষাঁড়টি শিং বাঁকিয়ে এমন তাড়া করল যে রাখালরা পালিয়ে বাঁচল।

বাড়িতে গেলে তার গলায় মুদ্রার পুটলি দেখে বুড়ি বলল বাছা এই মুদ্রা কোথায় পেলি? রাখালরা বুড়িকে সব ঘটনা খুলে বলল। আনন্দে দুঃখে বুড়ি কাঁদতে লাগল আর সন্তানসম ষাঁড়টির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল– বাবা, তুই এত কষ্ট করতে গেলি কেন? তোর কাঁধে দাগ পড়েছে। আমি তো তোকে না খাইয়ে রাখি না।

এর পর বুড়ি ষাঁড়টিকে স্নান করিয়ে কাঁধে ভালো করে তেল মাখিয়ে দিল। তারপর ভালো ভালো খাবার খেতে দিল। রাতে শুয়ে ষাঁড়ের গলা জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করল। টাকা পেয়ে বুড়ি ষাঁড়টিকে আরও ভালো ভালো খাওয়াতে লাগল। বুড়ি পাড়ার গরিব-দুঃখীদেরও সাহায্য করতে লাগল। তারপর এক সময় বুড়ি মারা গেল। কয়েকদিন পর ষাঁড়টিও মারা গেল এবং লোকশিক্ষার জন্য আবার অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করল। ■

ভারতের পথে পথে

ম্যাঙ্গালুরু

কর্ণাটক রাজ্যের নেত্রবতী ও গুরুপুর নদীর সঙ্গমস্থলে আরব সাগরের তীরে বন্দরনগরী ম্যাঙ্গালুরু। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে হাম্পী থেকে পশ্চিম উপকূলের সমস্ত মশলা আরব ও পারস্যের বাজারে যেত ম্যাঙ্গালুরু বন্দর দিয়ে। ষষ্ঠ শতকেও গোলমরিচ রপ্তানি হতো এই বন্দর দিয়ে। শহরের মূল আকর্ষণ মঙ্গলাদেবীর মন্দির। কথিত, নাথ সম্প্রদায়ের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্যা এই মন্দির ৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। শহরের নাম এই দেবীর নামেই নাকি হয়েছে। এখানে রয়েছে কাদরী পাহাড়, শ্রীমঞ্জুনাথ মন্দির, মহাগণপতি মন্দির ও কাদরী পাহাড়ে পাণ্ডব গুহা। মন্দির লাগোয়া ৭টি জলাধার রয়েছে। লোকের বিশ্বাস, এই জলাধারের জলে স্নান করলে চর্মরোগ ভালো হয়। শহর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে প্যানাম্বুর বন্দর। দক্ষিণে রয়েছে উল্লাল সমুদ্র সৈকত। সারা বছর দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ভিড় করেন।

জানো কি?

নোবেল প্রাইজ-২০১৮

- চিকিৎসাশাস্ত্রে পেয়েছেন আমেরিকার জেমস অ্যালিসন এবং জাপানের তাসুকু হঞ্জো।
- পদার্থবিদ্যায় আমেরিকার আর্থর অ্যাশকিন, ফ্রান্সের জেরার্ড মুরো এবং কানাডার ডোনা স্ট্রিকল্যাড।
- রসায়নশাস্ত্রে আমেরিকার ফ্রান্সে আর্নল্ড, জর্জ পি. স্মিথ এবং ইংল্যান্ডের গ্রেগরি পি. উইন্টার।
- শান্তিতে কঙ্গোর ডাঃ ডেনিস মুকাওয়েজ এবং ইরাকের নাদিয়া মুরাদ।
- অর্থনীতিতে আমেরিকার উইলিয়াম নর্ডহাউস এবং পল রোমার।

ভালো কথা

সিউলিকাকুর মিষ্টি রস

আমাদের পাড়ার সিউলিকাকু খুব ভালো মানুষ। এই শীতে সিউলিকাকু খেজুরগাছে রস লাগায়। রস লাগানোর জন্য কাকুকে গাছ প্রতি টাকা দিতে হয়। সিউলিকাকুর আসল নাম তাজিরুজ্জিন মণ্ডল। মা বলেছে যারা খেজুরগাছে রস লাগায় তাদের নাকি সিউলি বলে। সিউলিকাকু গরিব হলেও মনটা খুব ভালো। প্রতি রবিবার আমাদের ডেকে ডেকে রস খাওয়ায়। সকালবেলা সিউলিকাকুকে খেজুরগাছে উঠতে দেখলেই আমরা গেলাস নিয়ে হাজির হই। কেউ একজন না এলে আমাদের ডেকে নিয়ে আসতে বলে। একদিন সিউলিকাকুকে বললাম, তোমার রস এত মিষ্টি কেন? সিউলিকাকু বলল, রবিবারেরটাই মিষ্টি। প্রথম কাটা তো। আমি বললাম বিক্রি করলেই তো বেশি পয়সা পাও। সিউলিকাকু বলল তোদের খাওয়ালে অন্যদিন বেশি রস পড়ে।

তুহিন মহান্তি, নবম শ্রেণী, নামোপাড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) র গা মা য়া

(২) লা র মা ই

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ভি গ যা সা ন রা

(২) র ষো প ড় শো চা

১৭ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অকূলপাথার (২) আপাদমস্তক

১৭ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) দশকর্মভাণ্ডার (২) দেবচিকিৎসক

উত্তরদাতার নাম

(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর। (২) আলাপন দলই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (৩) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। (৪) স্বরূপ কুমার নাথ, বসিরহাট, উ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

সাপ্তাহিক রাশিফল

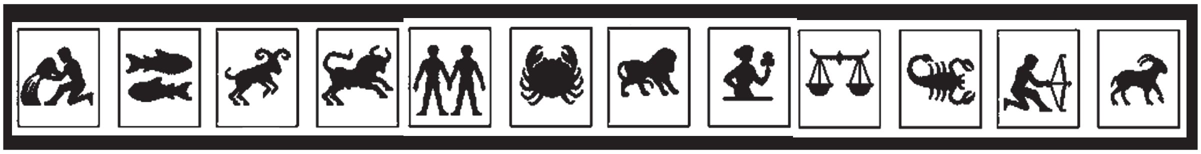

২১ জানুয়ারি (সোমবার) থেকে ২৭ জানুয়ারি (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি-শুক্র, ধনুতে শনি, মকরে রবি-বুধ-কেতু এবং মীনে মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্র থেকে তুলায় চিত্রা নক্ষত্রে।

মেষ : গৃহসুখ অটুট রাখতে মাতার শরীরের বিশেষ গুরুত্ব প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতা ও নিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য। বিদ্যার্থীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতায় নতুন চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবন। উত্তরাধিকার ব্যবসায় প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার। সপ্তাহের প্রান্তভাগে প্রেম-প্রীতি, শৌখিনতায় শিল্পানুরাগীদের স্বাচ্ছন্দ্য। সন্তান-সন্ততির চিন্তা-চেতনায় আধুনিকতা ও অপসংস্কৃতির পরশ।

বৃষ : আর্থিক দিক থেকে অনুকূল সপ্তাহ তবে রমণীর কুহকে ভদ্রসমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। পুলিশ, মিলিটারি, ক্রীড়াবিদ, বাহন চালকদের স্ত্রীর শরীরের বিষয়ে যত্নবান হওয়া দরকার। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে প্রশংসা যোগ। বাতজ-বেদনা ও রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত ক্লেশ।

মিথুন : বাঁকা পথে রোজগারের চিন্তা ও চেতনায় দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। স্ত্রীর সৌজন্যে সাংসারিক সমৃদ্ধি। পারিবারিক দায়িত্ব পালনে হৃদয় বত্তার পরিচয় দিলেও সমালোচিত হবেন। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির যোগ। ভ্রাতা-ভগ্নীর উন্নতিতে আনন্দ। যুবক বন্ধু হিতকারী নয়।

কর্কট : মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতা ও অতৃপ্তভাব ছায়াসঙ্গী। পাওনাগণ্ডার ব্যাপারে নিকট বন্ধুর বিরোধিতা। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা ও ভ্রমণযোগ নির্দিষ্ট হয়েও পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বেকারত্বের অবসান ও ব্যবসার উন্নতি বিধানে নতুন কার্যকরী পদক্ষেপ। সন্তানের লেখাপড়ার সাফল্যে গর্ববোধ। দেব-দ্বিজে ভক্তি ও গুরুজনে শ্রদ্ধা অটুট থাকবে।

সিংহ : অর্থ উপার্জন রমণীর প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি। মিষ্ট স্বভাব ও মানব বেদনার প্রতি অগাধ সহানুভূতি। জেদ পরিহার তথা সংযতভাব সাফল্যের মাপকাঠি। নতুন ধরনের পেশায় উৎসাহ বৃদ্ধি। বহুদিনের ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান ও পারিবারিক পুনর্মিলন। সন্তানের শাণিত কথাবার্তা, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও গুণীজনের সান্নিধ্যলাভ।

কন্যা : মার্জিত কর্ম। বয়স্ক মিত্রের সহযোগিতায় প্রতিকূল পরিবেশের অবসানে সাফল্য। মনের একাগ্রতায় জ্ঞান ও গবেষণায় মর্যাদা ও শংসা প্রাপ্তি। প্রমোটিং, দালালি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এম-এস ডিগ্রিধারীদের সাফল্যের পালক যুক্ত হবে। স্বার্থশূন্য, পরদুঃখকাতর। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে জীবনের নতুন দিশা।

তুলা : অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি, পুরানো গৃহসংস্কারে ও বাহন ক্রয়ে ব্যয় কৃষিভূমি ও পশুহানি, কর্মক্ষেত্রে বিলম্বিত পদোন্নতি। সন্তানের রক্ষণশীল মনোভাবে মানসিক বিভ্রান্তি। বন্ধুস্থানীয় ক্ষেত্রে শত্রুতা। বিদ্যার্থীর পড়াশোনায় একাগ্রতার অভাব। স্ত্রীর বাস্তব বুদ্ধি প্রতিকূল পরিবেশ অবসানের সহায়ক। অবিবাহিতের হঠাৎ বিবাহের যোগ। স্নায়ুপীড়ায় ক্লেশ।

বৃশ্চিক : বাস্তবতায় পার্থিব সুখ, ধনার্জন ক্ষমতাবৃদ্ধি। গবেষণায় পুরস্কার ও উচ্চশিক্ষায় বহুমুখী প্রতিভার বিকাশে সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। অনুভূতি শক্তি ও দক্ষতায় কর্মক্ষেত্রে সম্মান, প্রতিপত্তি, পদোন্নতি ও সুখকর বদলি। সাহিত্য, সংগীত ও কলাকুশলীদের বিত্ত, অভিজাত্য গৌরব ও সম্মাননা। ভ্রাতা-ভগিনীর উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা। পিতৃস্থানীয়ের শারীরিক অসুস্থতায় উদ্বেগ। সপ্তাহের শেষভাগে তীর্থ দর্শনে প্রবাস।

ধনু : যুবক বন্ধুর চক্রান্তে সম্পত্তি সংক্রান্ত জটিলতা। নতুন কর্ম ও ব্যবসার জটিলতায় আলোকবর্তিকা। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, চিন্তার স্বচ্ছতা, অধ্যবসায় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে উদার হৃদয়ের প্রকাশ। অধ্যাপক, গণিতজ্ঞ, বিচারপতি, প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিদের স্বচ্ছন্দ পদচারণা ও আভিজাত্য গৌরব।

মকর : বিদ্বান, পুত্র, আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহোদর সম্পর্কে উদার দৃষ্টিতে জীবনের ঝরাপাতায় নব বসন্তের পত্রোদ্গম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। উচ্চশিক্ষায় প্রবাস, পশম, কাষ্ঠ, খনিজতেল ও পরিবহণ ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সুখী জীবন লাভ। তবে অজীর্ণ, অম্ল ও সাইটিক ব্যথাবেদনায় ক্লেশ।

কুম্ভ : ক্রনিক পীড়া ও যথাযথ চিকিৎসায় বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার বাস্তব মূল্যায়নে রাহুর গ্রাস। স্বর্ণ, গ্রহরত্ন, বস্ত্র, ওষুধ ও বিলাস দ্রব্যের ব্যবসায় দেবী লক্ষ্মীর কৃপা লাভ। অবিবাহিতের প্রেমজনিত বিবাহ, তবে আনুষ্ঠানিক। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত ও কীটপতঙ্গ থেকে সতর্ক থাকা দরকার।

মীন : মেধা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সরলতা, নম্রতায় বিকশিত অন্তর ও পাণ্ডিত্য। জ্ঞানার্জন ও গবেষণায় নব উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ। বিত্ত, বৈভব, আভিজাত্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। নির্মাণ শিল্প, পুলিশ, মিলিটারি, ক্রীড়াবিদ, বাহন চালকদের পেশাদারিত্বের গৌরব, নিপুণতা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন। প্রেম-প্রণয় ও পত্নীরূপের প্রকাশ।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য